দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ১৬ অক্টোবর, ২০২৩।। ২৮ আশ্বিন - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে.....

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ২৮ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৬ অক্টোবর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

ঐতিহ্য ও বনেদিয়ানার মিশেলে আজও উমা-বরণ করেন মেদিনীপুরের রাজপরিবার ☐ ড. সৌমিত্র সেন ☐ ৬

সাঁওতালি ভাষাতেই মায়ের পূজায় মন্ত্রপাঠ করেন সাঁওতাল পুরোহিত ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ৭

আমতা রাজাপুর গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারের পূজায় দ্বাদশ কুমারী পূজিত হয় ☐ তাপস ভট্টাচার্য ☐ ৮

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবর্তিত সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজা ☐ বঙ্কুনাথ শীল ☐ ৯

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিশ্রণে হদল নারায়ণপুর গ্রামের দুর্গাপূজা ☐ সুস্মিতা দত্ত ☐ ১০

বঙ্গে দুর্গাপূজার ক্রমবিকাশ ☐ বিনয়ভূষণ দাশ ☐ ১১

শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ১৩

শারদোৎসব নয় দুর্গাপূজা ☐ বরুণ মণ্ডল ☐ ১৫

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মা দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন ☐ অরিত্র ঘোষ দস্তিদার ☐ ১৭

বালুরঘাটের সাহাবাড়িতে স্থান বদল হয় গণেশ ও কার্তিকের ☐ অজয় সরকার ☐ ১৯

কোচবিহারে বড়োদেবীর মূর্তি দুর্গার প্রচলিত রূপ থেকে আলাদা ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ২০

শান্তিপুর জজপণ্ডিতের বাড়ির দুর্গাপূজা ☐ ২১

বারুইপুর জমিদার বাড়ির সাবেকি দুর্গাপূজা ☐ ড. মানবেন্দ্র নস্কর ☐ ২২

রাষ্ট্রবাদী আদর্শের মহান ধারা স্বস্তিকার মতো জাতীয়তাবাদী পত্রিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকুক : মোহনরাও ভাগবত ☐ ২৩

মহলয়ার তর্পণ ☐ রবিব্রত ঘোষ ☐ ৩১

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা ☐ মদনমোহন সিংহ ☐ ৩২

আগমনী থেকে বিজয়া এক পারম্পরিক উদ্‌যাপন ☐ সুদীপ্ত কর ☐ ৩৪

চিক্কিগড়ের কনক দুর্গা ☐ তুফান মাহাত ☐ ৩৬

বাগবাজার হালদার বাড়ির দুর্গোৎসব ☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ৩৭

দুইবঙ্গকে আজও মিলিয়ে দেয় সিউড়ির বসাকবাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা ☐ তিলক সেনগুপ্ত ☐ ৩৮

ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুর চণ্ডীমন্দিরে দুর্গাপূজা ☐ দীপক চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩৯

কামারকিতা গ্রামের চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজায় আনন্দে মেতে ওঠে গ্রামবাসী ☐ ড. দেবনাথ মল্লিক ☐ ৪৩

জলপাইগুড়ি শহরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা ☐ নাড়ুগোপাল দে ☐ ৪৪

শিবপুর পালবাড়ির দুর্গা মা অভয়া রূপে পূজিতা ☐ শ্রীমতী অভয়া নাগ ☐ ৪৫

দশঘড়া বনেদিবাড়ির দুর্গাপূজা ☐ শুভজিৎ শূর ☐ ৪৬

ত্রিপুরার বনেদিবাড়ির দুর্গাপূজা ☐ কানু রঞ্জন দেবনাথ ☐ ৪৭

মহিষাদল রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা ☐ নারায়ণ চন্দ্র পণ্ডা ☐ ৪৯

আধুনিক দুর্গাপূজার আদিপীঠ গুপ্তিপাড়া দুর্গাবাড়ি ☐ পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে ৬ নভেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৬ নভেম্বর, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দ্বিশতজন্মবার্ষিকীতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদেরই একজন হলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁর দ্বিশতজন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করবেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, নিতাই নাগ, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, রবিরঞ্জন সেন প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আনন্দময়ীর আগমনে

বঙ্গজীবনে মহাপূজার ক্ষণটি সমাগত। মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠের মূর্ছনা বহু বৎসর যাবৎ বাঙ্গালি মননে দোলা দিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারও পূর্বে প্রকৃতিদেবীই মায়ের আগমন বার্তাটি ঘোষণা করিয়া দেয়। বঙ্গদেশের কবি-সাহিত্যিকরা তাহা নানাভাবে তাঁহাদের সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রকৃতি পর্যায়ের কবিতায় অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন—'মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য গন্ধে ভরিছে অবনী/ জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী/ পরেছে কিরীট কনককিরণে, মধুর মহিমা হরিতে হিরণে! কুসুমভূষণজড়িত চরণে, দাঁড়ায়েছে মোর জননী/ আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে— হাসিছে নিখিল অবনী।' বাঙ্গালি মননে এই প্রকৃতিদেবীই মা দুর্গা। তিনি জগজ্জননী। বঙ্কিমচন্দ্র মা দুর্গাকেই দেশজননী বলিয়াছেন। বন্দে মাতরম্ গানে তিনি দেশমাতৃকার স্তবকীর্তন করিয়াছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধের মন্ত্র দিয়াছেন। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা কবে শুরু হইয়াছে, তাহা লইয়া নানা মত রহিয়াছে। কিন্তু শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্তন যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছেন, তাহাতে কোনো দ্বিমত নাই। বিভিন্ন গ্রন্থে তাহার প্রমাণও রহিয়াছে। অত্যাচারী ও অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির জাগরণের নিমিত্তই শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালিও মা দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনীরূপেই পূজা করিয়াছে। তাহাতে তাহার অন্তর-বাহির শুদ্ধ হইয়াছে। পরম আনন্দ লাভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালি সেই মাকে নিজের কন্যা করিয়া লইয়াছে। দুর্গাপূজার চারদিন মা যেন পিতৃগৃহে আসেন। বাঙ্গালি স্নেহে-ভক্তিতে মায়ের পূজায় মাতিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। সমগ্র বঙ্গভূমিতে আনন্দের বান ডাকিয়া যায়। আজ বিশ্বায়নের যুগে বাঙ্গালি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গাপূজাকেও তাহারা বিশ্বব্যাপী করিয়াছে।

একটি কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গালি কি মায়ের পূজার মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবলই উৎসবে মাতিয়াছে? হ্যাঁ, ইহা বহুলাংশে সত্য যে ভক্তিহীন পূজার বাড়বাড়ন্ত শুরু হইয়াছে। পূজা আড়ম্বর অথবা দম্ভ প্রকাশের ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হইবে, দুর্গাপূজা বাণিজ্যিকীকরণ ও রাজনীতিকরণের ফাঁসে পড়িয়া তাহার কৌলিন্য হারাইতে বসিয়াছে। বহু পূজাসংস্থা সরকারি ফান্ড গ্রহণ করিয়া মাতৃআরাধনার পরিবর্তে নেত্রী আরাধনায় মাতিয়াছে। ধর্মদ্বেষীরা মাতৃপূজার ক্ষণ সমাগত হইলেই সমাজজীবনে বিভাজন সৃষ্টির প্রয়াসে অ অপপ্রচার চালাইয়া থাকেন। তাহাদের কেহ কেহ হুদুর দুর্গা প্রভৃতি রচনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরিয়া পরিবেশন করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। তাহারা খবর রাখেন না অথবা ইচ্ছা করিয়াই চুপ করিয়া থাকেন যে এই রাজ্যেই বহু জনজাতি গ্রামে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিজস্ব ভাষাতেই তাহারা মাতৃপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পূজার চারদিন তাহারাও আনন্দে মাতিয়া থাকেন। ধর্মদ্বেষী তথা আরবান নকশালরা দুর্গাপূজার সময় নানাভাবে পরিবেশ কলুষিত করিবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারিতেছে না। কোনোদিন তাহারা পারিবেও না।

এইকথা সত্য যে মায়ের পূজার আচারনিষ্ঠ ও ভক্তিনিষ্ঠ ভাবটি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রহিয়াছে পারিবারিক তথা বনেদি বাড়ির পূজাগুলিতে। সেইখানে পরম নিষ্ঠা, একান্ত ভক্তিভরে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইখানে মায়ের পূজায় দম্ভ নাই, আস্ফালন নাই, চাঁদার জুলুম নাই। পারিবারিক বা বনেদি বাড়ির পূজা হইলেও সমগ্র পল্লীর তাহাতে অংশগ্রহণ থাকে। সমগ্র পল্লী আনন্দে মাতিয়া ওঠে। ধর্মদ্বেষী, স্বার্থান্বেষী অথবা কুটিল রাজনীতির কারবারিরা মাতৃপূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া যতই বিভেদের বীজ বপন করিবার চেষ্টা করুক না কেন মা তাহাদের সেই অপচেষ্টা প্রতিবারই বিদূরিত করিয়া থাকেন। মা যে আনন্দময়ী। আনন্দময়ীর আগমনে কোনোপ্রকারের ভেদভাব, চক্রান্ত মাথা তুলিতে পারে না।

সুভাষিতম্

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
শীলং চ দুর্লভং তত্র বিনয়স্তত্র সুদুর্লভঃ।।

এ জগতে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। আর তার থেকেও দুর্লভ হলো জ্ঞান লাভ করা। এর থেকেও দুর্লভ সচ্চরিত্র অর্জন করা। আর সবচাইতে দুর্লভ হলো বিনয়ভাব অর্জন করা।

ঐতিহ্য ও বনেদিয়ানার মিশেলে আজও উমা-বরণ করেন মেদিনীপুরের মল্লিক রাজপরিবার

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধাত্রীভূমি মেদিনীপুর। সারস্বত সাধনার ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসেবেও ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। ভারতের পরিচয় শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনেই নয়, তার আত্মা নিহিত আছে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শাস্ত্র, গ্রন্থ, মনীষী ও রীতিনীতির মধ্যে। ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে মেদিনীপুরও সেই বৃহত্তর ভারতীয় আত্মারই একটি অংশ। দুর্গাপূজা ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব আড়ম্বর ও বনেদিয়ানার সঙ্গে উদ্‌যাপন মূলত সেই অনুষঙ্গেই শুরু হয়েছিল। রাজ-পরিবারের পূজা হলেও জন-আবেগ ও উন্মাদনায় ওই পূজাগুলো সর্বজনীন চেহারা নিত।

মেদিনীপুর ও মল্লিক রাজ-পরিবার বহু ক্ষেত্রেই সমার্থক। মেদিনীপুর শহরের বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির-সহ সমগ্র জেলায় বহু ঐতিহ্যবাহী মন্দির মল্লিক রাজ-পরিবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেদিনীপুরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এমনকী স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই পরিবারের বিশেষ অবদান আছে। এইবার আসা যাক দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে। মল্লিক রাজ-পরিবারের পূজা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা যোগাযোগ করেছিলাম ওই পরিবারের বংশধর উদয়ন করের সঙ্গে। উদয়নবাবুর সঙ্গে কথা বলে ও বিভিন্ন তথ্য সূত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় এই রাজপরিবারে পূজা ৩৫০ বছরের বেশি পুরনো। মুঘল আমলে, প্রশাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে পূজা শুরু হয়েছিল, সেই পূজার ঐতিহ্য আজও বহমান। ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্রে মল্লিক বাড়ির পূজা আর পাঁচটা পূজার থেকে অনেকটাই আলাদা।

পারিবারিক রীতি অনুযায়ী পূজার প্রস্তুতি শুরু হয় ফিরতি রথের দিন থেকে। মল্লিকদের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তের রথ যখন নগর ভ্রমণ করে মন্দিরমুখী হয়, তখন সেই রথ পথে দাঁড় করিয়ে মাটি সংগ্রহ করে রথে উঠিয়ে তা নিয়ে আসা হয় রাজবাড়িতে। ওই মাটি পরে দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। মল্লিকরা যে কোনো শুভ কাজের আগে রাধাকান্তের পূজা দিয়ে শুভ কাজ শুরু করেন। তাঁদের দুর্গাপূজা শুরু হয় মহালয়ার দিন থেকে এবং চলে নবমী পর্যন্ত। দশমীতে হয় বিসর্জন। মহালয়ায় দুর্গা পূজার প্রারম্ভেও রাধাকান্তের পূজা দিয়ে শারদীয়া মহাপূজা শুরু করা হয়। মহালয়া থেকে নবমী, অর্থাৎ পূজার শুরু থেকে শেষ অবধি মল্লিক পরিবারের সদস্যরা নিরামিষ খেয়ে মায়ের আরাধনা করেন। মল্লিক বাড়ির মাতৃপ্রতিমা একচালা নয় দু'চালার। দেবীর পশ্চাতে যে মেড় থাকে সেটি মাটি নয় কাঠ দিয়ে তৈরি হয় ও মাতৃপ্রতিমা মৃন্ময়ী। দেবীর পরিধানের যে বস্ত্র, তা বাজার থেকে কেনা কোনো ছাপা শাড়ি নয়। লালপাড় সাদা শাড়িকে হলুদ রঙে রাঙানো হয় ও সেই শাড়ি পরিধানের জন্য দেবীকে নিবেদন করা হয়। আগে মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে কামানের তোপধ্বনি সন্ধিক্ষণকে সূচিত করত, কিন্তু কোনো একবছর একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার জন্য সেই প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া বাকি সব প্রথা, রীতিনীতি, আগের মতোই অটুট আছে। বিজয়া দশমী কৃত্যেও অভিনবত্ব ধরা পড়ে এই পূজায়। বিসর্জনের জন্য দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় বাঁশের কাঠামোর উপর বসিয়ে। সেই বাঁশের কাঠামো-সহ দেবীকে বহন করেন ৩২ জন বাহক। ঠিক ৩২ জন, কমও নয়, বেশিও নয়। দেবীর বিসর্জনের পর পরিবারে নিয়ম ভঙ্গ হয় ও সকলে আমিষ ভক্ষণ করেন।

বেশ কয়েক দশক আগেও মল্লিক বাড়ির পূজাকে ঘিরে মেদিনীপুর শহর ও শহরতলি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা ও উৎসবমুখরতা দেখা যেত। গোরুর গাড়ি করে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মানুষজন আসতো মল্লিক বাড়িতে এবং পূজার কয়েকদিন তারা সেখানে থাকতো। ওই সময় মল্লিকবাড়ি বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করত। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো দুর্গাপূজার সময়। কোনো গ্রামে উৎপাদিত বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট পণ্য অন্যগ্রামের মানুষ কিনতে আগ্রহী হতো, আবার ওই গ্রামের অন্য উৎকর্ষ পণ্য অপর গ্রামের মানুষ কেনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতো। এই ভাবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলনোৎসবের ঐতিহ্যক্ষেত্র মল্লিক বাড়ি বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে পণ্য বিনিময় তথা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনেরও অনুঘটক হিসেবে কাজ করত। □

সাঁওতালি ভাষাতেই মায়ের পূজায় মন্ত্রপাঠ করেন সাঁওতাল পুরোহিত

তরুণ কুমার পণ্ডিত

প্রতিবছর দুর্গাপূজা এলেই জনজাতি সমাজের মহিলারা সেজেগুজে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে মাদল ও ধামসার তালে তালে সারিবদ্ধভাবে নেচে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আবার দুর্গা পূজার প্রাক্কালে এই সংবাদও পাওয়া যায় যে, জনজাতি সমাজের মানুষেরা হিন্দু নন। তারা মা দুর্গার নয়, অসুরের পূজা করেন। কিন্তু এই রাজ্যেই বহু জনজাতি গ্রামে জনজাতিরাই দুর্গাপূজা করে থাকেন তার খবর তারা রাখেন না। মালদা জেলার কেন্দ্রপুকুরের ভাঙাদিঘি গ্রামে সাঁওতালরাই দুর্গাপূজা করে আসছেন বংশপরম্পরায়। এই দুর্গা পূজার প্রধান উদ্যোক্তা বাবুলাল হাঁসদা। সেখানে বছরের পর বছর ধরে বাবুলাল হাঁসদা দেবী দুর্গার আরাধনা করে চলেছেন। যদিও এই আরাধনার পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। বাবুলাল হাঁসদার কথায়, তাঁর ঠাকুরদা লব হাঁসদা বাংলাদেশের নাচোল থানার হাকবোল গ্রামে বসবাস করতেন। তিনিই প্রথম সেখানে দুর্গা পূজা শুরু করেন। বাবুলাল হাঁসদার বাবাও দুর্গা দেবীর ঘট পূজা করেছিলেন। ১৫০ বছরের পুরনো এই দুর্গাপূজা বাংলাদেশ থেকে এপারে আসার পরেও বাবার মৃত্যুর পর বাবুলাল পূজার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

তিনি বলেন, মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে ২০০০ সাল থেকে মূর্তি পূজা শুরু করি। প্রথমে এই দুর্গাপূজা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে পুরো গ্রামের মানুষের পূজা হয়ে গিয়েছে। আশেপাশের পাঁচটি গ্রাম থেকে কয়েক হাজার জনজাতি মানুষ এই প্রাচীন পূজায় অংশগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র রীতি ভেঙেই যে এই দুর্গা পূজা হচ্ছে তাই নয়, এই পূজার আর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সংস্কৃত মন্ত্রের পরিবর্তে সাঁওতালি ভাষাতেই মা পূজিতা হন এবং ব্রাহ্মণের পরিবর্তে বাবুলাল নিজেই এই দুর্গা পূজা পাঁচদিন ধরে করে থাকেন। তাঁকে পূজায় সাহায্য করে বাড়ির মেয়েরা, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী ও বড়ো মেয়ে। এই পূজা দেখতে আশে পাশের মানুষদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। বাবুলাল হাঁসদার এই দুর্গা পূজার মধ্যে দেবীর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। এর আরও প্রমাণ মেলে নিজের বড়ো মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, দুর্গামণি হাঁসদা। পূজার সময়ে দুর্গার বেদিতে আলপনা দেওয়া থেকে শুরু করে মণ্ডপ সাজগোজের দায়িত্ব পালন করেন দুর্গামণি হাঁসদা। নবমীর দিনে বাবুলাল হাঁসদার এই দুর্গাপূজায় আশেপাশের পাঁচটি গ্রাম থেকে খিচুড়ি ভোগ পেতে কয়েক হাজার জনজাতি মানুষের সমাগম ঘটে।

কথায় কথায় বাবুলাল বললেন, আমরা তো রামচন্দ্রের বংশধর। কেননা রামের হাতের তির-ধনকুই তো আমরা জনজাতি সমাজের মানুষদের হাতে সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা জনজাতিরা কি হিন্দু নায়? উত্তরে বাবুলাল বললেন, ইদানীং খ্রিস্টানরা আমাদের সমাজের মানুষদের ভুল বুঝিয়ে সারনা ধর্মের কথা বলছে। কিন্তু আমরা বরাবরই হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। মারাংবুরুকে যারা পূজা করছে তারা মহাদেব শিবের পূজা করছে। এই দুর্গা পূজায় মা-দুর্গার হাতে যেসব অস্ত্র থাকে সেটাতো আমাদের জনজাতি সমাজ ব্যবহার করে।

আমাদের সমাজের কিছু মানুষদের অসুস্থ হলে তাদের ওষুধ দেওয়ার নামে সেবার আড়ালে খ্রিস্টানরা ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত করছে। তবে এখন অনেকে শিক্ষিত হয়ে তাদের এই চক্রান্ত ধরা পড়েছে। □

আমতা রাজাপুর গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারের দুর্গাপূজায় দ্বাদশ কুমারী পূজিত হয়

তাপস ভট্টাচার্য

বাংলা ১১৯২ সালের ২৪শে আশ্বিন ইংরেজি ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর রবিবার ষষ্ঠী তিথিতে আমতা থানায় ভুরশুট পরগনার অধীনে রাজাপুর গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারে প্রথম দুর্গাপূজা শুভারম্ভ করেন পরিবারের যদুনাথ ভট্টাচার্য। সেই সময় মাটির দেওয়াল খড়ের চালের মন্দিরে পূজা শুরু হয়।

পাঁচ পুরুষ ধরে এই পূজা চলে আসছে। ১৯৮০-১৯৮৩ সালে এই চার বছর পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কারণে পূজা বন্ধ থাকে, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নিরন্তর গতিতে পূজা হয়ে আসছে। গত ১০০ বছর ধরে নতুন বস্ত্রদান ও নবমীর দিন দরিদ্র নারায়ণ সেবা গত ২০০৫ সাল পর্যন্ত চলেছে।

এই দুর্গা মন্দিরে দেবেন্দ্র চতুষ্পাঠী নামে টোল দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে চলেছে গত ২০১৮ সাল পর্যন্ত। এখানে সংস্কৃত শিক্ষা ও পূজা পাঠ সম্বন্ধে সংস্কারিত

পদ্ধতি দ্বারা পূজাপাঠ শিক্ষা দেওয়া হতো। ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ সাল দরিদ্র পরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তানদের উপনয়ন সংস্কার করা হয়েছে। প্রতি বছর ৭ জন থেকে ৯ জন সন্তানকে উপনয়নের সমস্ত বিধি মেনে পূজা সংস্কার, যজ্ঞের দ্বারা যোগ্য উপবিত প্রদান করার অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

বর্তমানে এই মন্দির গত ১২০ বছর আগে কড়ি বর্গা ও ইটের দেওয়াল দ্বারা নির্মাণ করা হয়। মাটির দ্বারা নির্মিত একচালা প্রতিমাতে পূজা হতো, কিন্তু গত ২০১৯-এ পরিবারে সকলের মনে চিন্তা এলো যে আমরা বছরে ১ বার কেন, ৩৬৫ দিনই মায়ের পূজা আরতি করবো। ১ বছর ধরে চিন্তন মন্থনের পর সকলে মিলে সিদ্ধান্ত হয় যে ২০২০ সাল থেকে ধাতুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে ও নিত্য প্রতিদিন পূজা আরতি করা হবে। সেই থেকে ধাতু মুর্তিতেই পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নবমীতে ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করা হয়ে থাকে।

২০২০ সাল থেকে পরিবারের সকলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অন্ত্যজ/অনুসূচিত সমাজের কন্যাকে দেবীরূপে পূজা করা হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যে দেশে নারী পুজিত হয় না সে দেশ কখনো বড়ো হতে পারে না।' আমাদের শাস্ত্রে আছে, 'জাতি ভেদ ন কর্তব্য— কুমারী পূজনে শিবে। তাই কেবল ব্রাহ্মণ কন্যা নয় সকল শ্রেণীর কন্যাকেই (৫ বছর থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত) পূজা করা যেতে পারে। সেইমতো গত ২০২০ সাল থেকে ২০২২ এই তিন বছর গঙ্গা জলে পা ধুইয়ে পূজা, আরতি, যজ্ঞের দ্বারা পঞ্চমীর দিন পূজা করা হয়েছে।

প্রতি বছর ১২ জন দলিত কন্যাকে পূজা করা হয়েছে। □

খাতড়া শহরের পোদ্দার পাড়ার সুবর্ণ বণিক সমাজের একশো ত্রিশ বছরের পুরোনো পারিবারিক দুর্গাপূজা

স্বরূপ মণ্ডল

১৩০০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত এই দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেখা যায় না। উমা শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে তার স্বামী সন্তানদের নিয়ে একেবারে সপরিবারে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। সমস্ত সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের আয়ের উৎসে এই পূজা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ তাদের পূর্বপুরুষদের পারিবারিক পূজা। এই পূজা আর পাঁচটা পূজার মতো হলেও দেবী মহিষাসুরমর্দিনী রূপে থাকে না। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী রীতি মেনে পূজা হলেও বিগত দিনে দশমীতে বিসর্জন দিতে হয়।

পুরাণে কথিত আছে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মানুষ বাণিজ্যিক শান্তি কামনা স্থাপনে পূর্বপুরুষরা দেবীদূর্গাকে এই রূপে পূজিত করেছেন। পরম্পরা ধারায় চলে আসছে এই প্রাচীন আঙ্গিকের পূজামণ্ডপ। খাতড়া রাজাপাড়ায় রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপ আরও প্রাচীন। আনুমানিক প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো এই রাজবাড়ির পূজার পরের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রাচীনতম পূজা হলো এই সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পূজা।

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবর্তিত সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজা

বৈকুণ্ঠনাথ শীল

আচার্য অতীন্দ্রনাথ বসুর এক অমোঘ আখ্যান দিয়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজার সূচনা ১৯২৬ সালে। এক চালার মধ্যে মা তাঁর সন্তানদের নিয়ে বিরাজ করতেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশি দ্রব্য পরিহার, বিলাতি পরিধেয় বস্ত্রাদির পরিবর্তে দেশি সূতিবস্ত্রের প্রচলন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মূল মন্ত্র ছিল। সেই সূত্র ধরেই মায়ের পরিধেয় বস্ত্র ছিল খদ্দরের শাড়ি এবং সেই থেকেই সর্বজনীন দুর্গাপূজার নাম হলো 'স্বদেশি' ঠাকুর। এই নামের প্রবক্তা হলেন আচার্য অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা ব্যায়াম সমিতি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান। এখানে মায়ের পূজাকে সামনে রেখে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও ক্ষুরধার করার জন্য এই পুণ্যভূমিতে একত্রিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, বঙ্কিম মুখার্জি, ডাঃ নারায়ণ রায়, কল্পনা দত্ত প্রমুখ। যে পূজা শুধুমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণী, জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না, সেই বেড়াজাল ভেঙে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলন মেলার প্রচলন হলো প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপূজা। এর মূল স্রষ্টা সিমলা ব্যায়াম সমিতি। এই পূজার প্রচলন এক চালার মাধ্যমে। এই পূজার এক পবিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আলাদা ভাবে পাঁচ চালায় রূপান্তরিত হলো ১৯৩৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের পরিকল্পনার মাধ্যমে।

অদ্যাবধি এই ধারাবাহিকতার মর্যাদা আমরা অটুট রাখতে পেরেছি। বৈভব, কৌলিন্য আর ঐতিহ্য যে পূজার মূলধন, সাবেকীয়ানার মেলবন্ধন তাকে অটুট, অক্ষুণ্ণ রাখাই আমাদের ধর্ম। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে ধরে রাখার পক্ষপাতী আমরা। পরম্পরার মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ধারাবাহিকতায় আমরা অবগাহন করে চলেছি।

আমাদের পূর্বসূরিরা যে নিদর্শন রেখে গিয়েছেন, উত্তরসূরিরা তাকে অনুসরণ করে অনুগমনে দায়বদ্ধ। ৯৮ বছরের পূজার উৎকর্ষতাকে সামনে রেখে শতবর্ষের পূজার হাতছানির মধ্য দিয়ে আমাদের স্বপ্ন দেখা শুরু। বাস্তবায়িত হোক সেই স্বপ্ন এবং আমদের পথ চলা তাকে সামনে রেখেই।

অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আমরা অবিচল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নানারকম ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনার জন্য আমরা অবচিল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১০০ বছর পূর্তি উৎসব খুব সহজ কথা নয় কিন্তু সমবেত চেষ্টা আর আত্মবিশ্বাস আমাদের চির উন্নতশির করে রাখবে এই ভরসা বুকে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সহৃদয় মানুষের ভালোবাসা, পৃষ্ঠপোষকতা তথা সার্বিক আর্থিক-সহযোগিতাই আমাদের চলার পথে পাথেয়। যাঁদের আশীর্বাদ, ভরসা আর দেখানো পথ ধরেই আমাদের এই উত্তরণ। আশা করি তার মর্যাদা আমরা প্রতিটা স্তরে ধরে রাখতে পারবো।

ইতিমধ্যেই আমরা ২০১৮ সালে প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে আমাদের পূজা সংবলিত এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। সেই পুস্তকে সবিস্তারে ছবি-সহ বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে এই মহাপূজার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করি আগামী শতবার্ষিকীতে আমরা আরও একটা নতুন পুস্তক আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ২০ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত স্বস্তিকা কার্যালয় বন্ধ থাকবে। এই পূজাবকাশের জন্য স্বস্তিকার আগামী ২৩ অক্টোবর এবং ৩০ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৬ নভেম্বর থেকে স্বস্তিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

—স্বঃ সঃ

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিশ্রণে হদলনারায়ণপুর গ্রামের দুর্গাপূজা

সুস্মিতা দত্ত

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের হদলনারায়ণপুর গ্রামে রামপুর বড়মণ্ডল দেবোত্তর এস্টেটের পারিবারিক দুর্গাপূজা প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো। প্রাচীনত্বের সঙ্গে নবীনত্বের সার্থক মিলনক্ষেত্র রূপে এই পারিবারিক পূজা যথেষ্ট পরিচিত।

বাঁকুড়া মানেই মল্লরাজের ঐতিহ্য। পূজার সঙ্গে জড়িয়ে দীর্ঘ ইতিহাস বর্ধমান মহারাজের দেওয়ান ছিলেন মুচিরাম ঘোষ। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহদেবের সময়ে পাত্রসায়েরের নারায়ণপুরে আসেন তিনি। এখানে তাঁর পরিচয় হয় প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর রায়ের সঙ্গে। শুভঙ্কর রায় গণিতশাস্ত্রে যে সরল পন্থা এনেছিলেন, মুচিরাম ঘোষ তা শিখিয়েছিলেন মল্লরাজকে। সন্তুষ্ট হয়ে মল্লরাজ তাঁকে হদল ও নারায়ণপুর-সহ বেশ কিছু পরগনার জমিদারি ছাড়াও মণ্ডল উপাধি প্রদান করেন। সেই সময় থেকেই শুরু হয় এই বাড়ির দুর্গাপূজা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ কুশারী ভাগে পেয়েছিলেন এই গ্রাম। তাঁর নাম থেকেই গ্রামের নাম হয় নারায়ণপুর। স্থানীয় মানুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম হদলের সঙ্গে জুড়ে হদলনারায়ণপুরই বলেন।

শুধু তাই নয়, পূজার ইতিহাসে জড়িয়ে দৈবমহিমাও। কথিত, নীল বিক্রি করে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে বজরায় করে গ্রামে ফেরার সময় জলদস্যুর কবলে পড়েছিলেন বেচারাম মণ্ডল। তখনই বজরায় থাকা সম্পত্তি দেবতাকে দান করার মানত করেন এবং সে যাত্রায় রক্ষাও পান। ফিরে তৈরি করেন বিশাল দুর্গাদালান, রথ মন্দির, রাসমঞ্চ মন্দির, নাটমন্দির এবং নহবতখানা। বেলজিয়াম গ্লাসের বিশাল ঝাড়বাতিতে সেজে ওঠে গোটা বাড়ি। বংশপরম্পরায় পূজা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বহু জমি কিনে তিনি দেবোত্তর করে দেন। একদিকে নীলকুঠির আয়, অন্যদিকে বিশাল জমিদারির খাজনায় ফুলে ফেঁপে ওঠে মণ্ডল পরিবারের অর্থভাণ্ডার। সপরিবার ডাকের সাজে পূজা হয় মায়ের। পূজার প্রতিটি নির্ঘণ্ট ঘোষিত হয় তোপধ্বনিতে। আর শেষে পরিবারের সকলে মিলে সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা। জন্মাষ্টমীতে গঙ্গামাটি লেপনের মধ্যে দিয়ে পূজার শুভ সূচনা হয়। দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকেই মহাষ্টমীর দিন দেবীর পূজার ভোগের জন্য গজা, মণ্ডা, মিঠাই, নাড়ু-সহ হরেকরকম মিষ্টি তৈরি হয়। মন্দির চত্বরে থালায় থালায় থরে থরে সাজানো থাকে নানা রকমের মিষ্টি। অষ্টমীর পূজায় সেই মিষ্টি দিয়েই দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। বাইরের কোনও মিষ্টি সেদিন দেবীর ভোগে দেওয়া নিষিদ্ধ। পূজার চারদিন ধরে চলে নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পারিবারিক সৌহার্দ্যবর্ধনে গৃহকর্ত্রীদের রন্ধনভার থেকে মুক্তি পেতে পূজার সময় সমবেত ভোজনের আয়োজন হয়। অর্থাৎ বৃহৎ বৃত্তের বাইরে থেকেও উৎসবের রঙে সেজে উঠে প্রতিবছরই নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়ে যায় হদলনারায়ণপুর গ্রামের বড়মণ্ডল বংশের পারিবারিক দুর্গাপূজা। □

বঙ্গে দুর্গাপূজার ক্রমবিকাশ

বিনয়ভূষণ দাশ

সাম্প্রতিককালে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়ে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শরৎকালীন দুর্গাপূজা কৃষ্ণনগর অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁর দেখাদেখি শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই পূজার প্রচলন করেন। এটা ঠিকই, পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, শরৎকালে ওই দুজন দুর্গাপূজা করেন। ক্লাইভ যুদ্ধবিজয়ের অঙ্গ হিসেবে নিজে কোনো গির্জায় উৎসব না করে হিন্দুদের দুর্গাপূজায় আনন্দোৎসব করেছিলেন। কিন্তু সেটি এই রাজ্যের প্রথম শারদীয় দুর্গাপূজা ছিল না। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে ঠিক কবে দুর্গাকে দেবী হিসেবে অর্চনা করা শুরু হয় তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। তবে দুর্গাকে দেবী হিসেবে আরাধনা করার সূত্র পাওয়া যায় এদেশের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে।

ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তমে সামবিধান ব্রাহ্মণ অংশের তৃতীয় মণ্ডল, অষ্টম অনুবাক্যের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভুং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীচক্ষুষে বান্তঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায় আপঃ স্নেহায় মনঃ অনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরম্ অর্থাৎ যে ব্রহ্মরূপা মহামায়া বারবার অসুরবধের জন্য আবির্ভূতা হন, যিনি প্রাণীগণের সুখদাত্রী ও কন্যারূপিণী, যিনি শিখণ্ডিনী অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছভূষণা এবং কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টিভূতা, সেই রাত্রিরূপা দেবীর শরণাপন্ন হই। তাঁর প্রভাবে সূর্য চক্ষুদ্বয়কে শ্রীযুক্ত করে রক্ষা করুন; বায়ুদেবতা পঞ্চণ রক্ষা করুন; সোমদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন, বরুণদেব সকল তরল পদার্থ রক্ষা করুন; চন্দ্রদেব আমার মন রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার শরীর রক্ষা করুন। এই রাত্রিসূক্তে যে দেবীর কল্পনা করা হয়েছে তিনিই দেবী দুর্গার আদি রূপ। আবার পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর লেখা শ্রীরাম পাঁচালী বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গাপূজা করার কথা উল্লেখ করেন।

দুর্গাপূজার মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।' মূল রামায়ণে শরৎকালে দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। ওই পঞ্চদশ শতকেই, ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন এই রাজ্যের তাহেরপুরের জমিদার, রাজা কংসনারায়ণ প্রথম শ্রীরাম পাঁচালীর বর্ণনা অনুযায়ী শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এই কংসনারায়ণের পূর্বপুরুষ কামদেব ভট্ট রাজশাহী জেলার তাহেরপুরে বরাহি বা বড়োনাই নদীর তীরে তাহেরপুরে জমিদারির পত্তন করেন সুলতানি আমলে। তিনি ওই অঞ্চলের জমিদার তাহির খাঁকে পদচ্যুত করে জমিদারি লাভ করেন। কামদেব ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই জমিদারি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন রাজা হরিনারায়ণের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ। কথিত আছে, তিনি নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে খুব জাঁকজমক-সহ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বর্তমান ধারার দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ওই মন্দিরলিপিতেও এ কথার সাক্ষ্য মেলে। রাজা কংসনারায়ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তিনি তাঁদের রাজ পুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর কাছে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ বা ওই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করতে অনুমতি চাইলে শাস্ত্রী মহোদয় তাঁকে দুর্গাপূজার বিধান দেন, কারণ কলিযুগে কোনো অধীনস্থ রাজা বা জমিদারের পক্ষে এটাই উত্তম পন্থা। পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা কংসনারায়ণ ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। এই দুর্গাপূজা তিনি কবি কৃত্তিবাসের বর্ণনা অনুযায়ী শরৎকালে করেন। রাজা রামচন্দ্র লঙ্কারাজ রাবণবধকল্পে শরৎকালেই দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন।

রাজা কংসনারায়ণকৃত শরৎকালের এই দুর্গাপূজাই সময়ান্তরে সমগ্রবঙ্গের হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়। দেবীর এই অকালবোধন এবং শরৎকালে এই রাজ্যে দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ লিখিত উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে বলা হয়েছে, '১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী কুল্লুকভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণকে উক্ত দুর্গোৎসব করিতে পরামর্শ দেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অদ্যাবধি প্রতিমায় দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে বাড়িয়া চলিতেছে।' এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও উদ্বোধন প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতে' ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের কথা বলা হয়েছে, তাহেরপুরের মন্দিরলিপি এবং অন্যত্র ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও তাহেরপুরের প্রথম দুর্গাপূজার সপক্ষে অনেক তথ্যাবলি রয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঁচশত বছরের প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত তাহেরপুরের দুর্গামন্দিরকে বাংলাদেশের 'জাতীয় মন্দির' হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছে। এ ঘটনাও প্রমাণ করে, তাহেরপুরই সমগ্র অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের প্রথম দুর্গাপূজার মন্দিরস্থল। সুলতানি আমলে বঙ্গে দুর্গাপূজা শুরু হওয়া প্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক গবেষক বলেছেন যে, যোদ্ধা দেবী দুর্গা ও তাঁর আরও ভয়ংকর কালীরূপের আরাধনা বঙ্গে মুসলমান আক্রমণ এবং তাঁদের বঙ্গবিজয়ের সময়, তার পরে শুরু হয়েছে। এর কারণ হিন্দু রাজশক্তি ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয় নিজের স্বভূমিতেই। ফলে যুদ্ধের দেবী দুর্গা আরাধনাতেই তাঁরা নিজস্ব 'পরিচিতি' খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।

তাহেরপুরের পরে আমরা পাই কুচবিহারের রাজপরিবারের দুর্গাপূজার কথা। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্ব সিংহ তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'দুর্গাবাড়ি' বা 'দেবীবাড়ি' মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। আবার কারও কারও মতে, দিনাজপুর ও মালদহের জমিদারগণ প্রথম দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। এর পরে যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপূজার কথা আমরা জানতে পারি সেটা হলো বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা। ওই পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের আটচালা দুর্গামন্দিরে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। এই পূজা বঙ্গপ্রদেশের অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপূজা। বর্তমানে পরিবারের সেই পুজো সাত শরিকে বিভক্ত হয়ে গেছে। ছয় শরিকের পুজো বড়িশাতেই হয়, সপ্তমটি বিরাটিতে হয়। এছাড়া আন্দুলের দত্তচৌধুরী জমিদার পরিবারের দুর্গাপূজাও খুব প্রাচীন পূজা। এই পরিবারের কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই পরিবারের কেউ কেউ দাবি

ফঃ ২

করেন, তাঁদের পরিবারের তেকড়ি বা তিনকড়ি দত্ত পঞ্চদশ শতকেই দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। তান্ত্রিকমতে এই পুজোতে ছাগবলি দেওয়া হতো। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রভাবে এই পরিবারের কৃষ্ণানন্দ দত্ত বৈষ্ণব মতাবলম্বী হলে তাঁদের পূজায় বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়। তবে যিনিই দুর্গাপূজা প্রচলন করুন, এই পূজা যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই বঙ্গপ্রদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা শুরুর প্রথম দিকে হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত অংশেই এই পূজা সীমিত ছিল। মূলত প্রতিপত্তিশালী জমিদার শ্রেণীই এই পূজার অনুষ্ঠান করত। এই শ্রেণী প্রচুর জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহের মাধ্যমে তাঁদের আভিজাত্য প্রকাশ করতে চাইত এই পূজার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে, এদেশে ইংরেজ শাসন প্রসারের ফলে এক নতুন ব্যবসায়ী ও জমিদারশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই এই নতুন শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক লেন-দেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এঁরা কলকাতার 'বাবু' সমাজের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। এঁরা দেশের নতুন রাজা, ইংরেজদের তাঁদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। এই অংশের মধ্যমণি ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর। বড়লাট ক্লাইভের আনুকূল্যে ও বদান্যতায় তাঁরা অতি জাঁকজমকের সঙ্গে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। তাঁদের ওই পূজায় নানা অহিন্দুসুলভ বিষয়ও ঢুকে পড়ে ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরেজদের তুষ্ট করার চেষ্টায়; সেখানে বাইজি নাচের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। দুর্গাপূজা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল আভিজাত্য ও অহমিকা প্রকাশের এক মাধ্যম। ওই একই বছরে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও দুর্গাপূজা শুরু করেন। তাঁর পুজোতেও ইংরেজদের আনাগোনা ছিল। এছাড়া জানবাজারের রানি রাসমণির বাড়ির দুর্গাপূজাও খুব খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু তাঁর বাড়িতে দেশীয় আচারেই পূজা অনুষ্ঠিত হতো, সেখানে ইংরেজদের আনাগোনা ছিল না।

শোভাবাজার, কৃষ্ণনগর এবং রানি রাসমণির বাড়িতে আজও অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে দুর্গাপূজা। তবে এগুলির কোনোটিই বঙ্গদেশের দুর্গাপূজা নয়। তাঁরাও সেটা দাবি করেননি। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির ইতিহাস, 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' বা শোভাবাজার রাজবাড়ির ইতিহাসদ্বয়, 'শব্দকল্পদ্রুম' বা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরের 'কলকাতার ইতিহাস' ইত্যাদি কোনো গ্রন্থেই কিন্তু তাঁদের পরিবারের পুজোকে বঙ্গদেশের প্রথম দুর্গাপূজা বলে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে দুর্গাচন্দ্র সান্যাল-সহ অন্যান্যদের লেখা 'বাঙ্গলার সামাজিক' ইতিহাসে এ বিষয়ে অনেক তথ্য উল্লিখিত আছে। এই দুটি পূজার প্রায় পনেরো বছর আগেই, মরাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলের মন্ত্রী ও সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহাটকর বঙ্গপ্রদেশে চৌথ আদায় করতে এসে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে দাঁইহাটে বঙ্গীয় প্রথামতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই পূজাও ১৭৫৭ সালের প্রায় ১৫ বছর আগের ঘটনা।

এছাড়াও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালি স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি বর্ণনা করেছেন। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি (১৪২৫-১৪৮০) তাঁর ক্রিয়াচিন্তামণি এবং 'বাসন্তী-পূজাপ্রকরন' পুস্তক দুটিতে দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতির বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও তাঁর 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থে ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃন্ময়ী দেবীর পূজাপদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে, বঙ্গদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হাজার বছরের বেশি প্রাচীন। এক সময়ে বঙ্গদেশের ধনী গৃহস্থের বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকতই। নবদ্বীপে মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের চণ্ডীমণ্ডপে চৈতন্যদেব টোল খুলেছিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু খড়দহে নিজের বাড়িতে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করতেন। এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, অনেককাল আগে থেকেই বঙ্গদেশে মূর্তিতে দুর্গাপূজা প্রচলিত ছিল।

এই দুর্গাপূজা কিন্তু একসময় জমিদারের ঠাকুরদালান বা অভিজাত বাবুশ্রেণীর নাটমন্দিরের বাইরে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। কথিত, গুপ্তিপাড়ার কিছু যুবককে এক গৃহস্থের পূজাতে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৎকালীন হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার ওই যুবকদের মধ্যেকার বারোজন ব্রাহ্মণযুবক বন্ধুরা মিলে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে এসে দুর্গাপূজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁদের প্রতিবেশীরা এতে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু ওই বারোজন যুবক প্রতিবেশীদের সন্দেহকে গুরুত্ব না দিয়ে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন। বারোজন ইয়ার বা বন্ধু মিলে করেছিল বলে ওই পূজা 'বারইয়ারি' বা 'বারোয়ারি' পূজা নামে খ্যাত হয়। সাম্প্রতিককালে 'বারোয়ারি' শব্দটির পরিবর্তে 'সর্বজনীন' কথাটি বেশি প্রচলিত হয়ে পড়েছে, যদিও আমরা কম বয়সে 'বারোয়ারি' কথাটিই বেশি শুনতাম। ইতিহাস ও নাট্য গবেষক এবং কাশিমবাজার রাজপরিবারের সদস্য ড. সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর প্রকাশিত 'দুর্গাপূজা ঃ এ ন্যাশনাল অ্যাপ্রোচ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ, রাজা কৃষ্ণনাথের পিতা, রাজা হরিনাথ রায় তাঁদের কাশিমবাজার রাজবাড়িতে ১৮২৪ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ অবধি দুর্গাপূজা করেছেন এবং তিনিই কলকাতায় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে 'বারোয়ারি' দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। ধীরে ধীরে 'বারোয়ারি' কথাটির স্থলে 'সর্বজনীন' কথাটি প্রচলিত হয় সেটা আগেই বলেছি।

সার্বজনীন কথাটি কলকাতায় প্রথম ব্যবহার করে সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা। বাগবাজারে তাঁদের ওই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। সর্বসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেই ওই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আঠারো শতকের জমিদারি আভিজাত্য আর নব্য ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর দুর্গাপূজা বিংশ শতাব্দীতে এসে স্বাধীনতাকামী, জাতীয়তাবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। দুর্গাপূজাকে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। দুর্গাদেবীকে শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করতেন তাঁরা। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে লেখা তাঁর 'আনন্দমঠে' দুর্গাকে 'দেশজননী' হিসেবে চিত্রিত করলেন। তিনি দেখালেন 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন।' মা দুর্গার বন্দনায় ধ্বনিত হলো 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। ১৯০৩ সালের ৩ অক্টোবর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় পূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হলো, 'দুর্গামূর্তি আমাদের ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, তিনি যা আছেন তা নয়, তিনি যা হইবেন তাহার প্রতীক।' সেখানে লেখা হলো, 'Nothing Bideshi Everything Swadeshi.'। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলিতে তিনি মূর্ত হয়ে উঠলেন 'দেশজননী' 'ভারতমাতা' রূপে।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেন। তিনি তাঁর মাতৃসমা দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবীকে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫-এর এক চিঠিতে লিখলেন, 'আজ মহাষ্টমী। আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বছর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই, তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও বাঙ্গালি হিন্দুর কাছে দুর্গা 'কন্যারূপী' উমা; আবার তিনিই ভয়হারিণী, শক্তিরূপিণী-অসুর-দলনী-অভয়দাত্রী-দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা। তিনি আমাদের মধ্যে অসুরবিনাশী শক্তিরূপে বিরাজিতা। কাল থেকে কালান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে তিনি আছেন আমাদের অন্তরে। ◘

শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

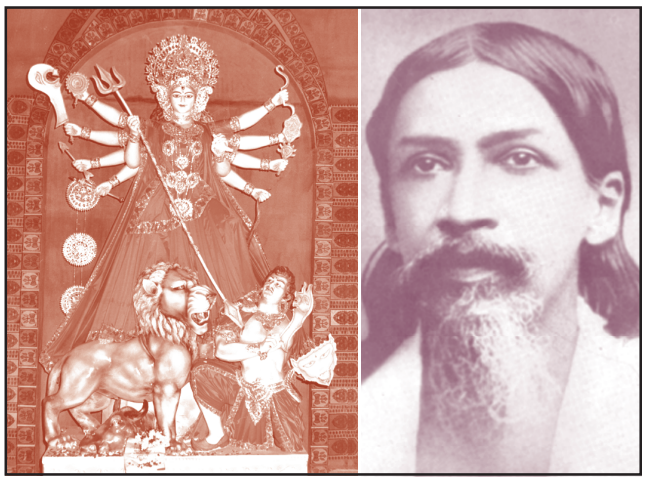

বঙ্কিমী প্রভাবে বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনা থেকেই একদিন বঙ্গীয় যুবকদের যাবতীয় শক্তির উৎসকে খুঁজে দিয়েছিলেন তিনি, পুরো ব্রিটিশ ভারত তখন শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে তোলপাড়। এরই মধ্যে তিনি উপস্থাপন করলেন বঙ্গপ্রদেশের শক্তি-সাধনার এক অনন্য ধারা— যে বঙ্গভূমি তন্ত্রের পীঠস্থান, যেখানে আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, যেখানে ভগবান মাতৃরূপে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত, তারই আদলে দেশমাতৃকাকে দেখার চৈতন্য। স্বাধীনতাকামী যুবক তাই তাঁর মধ্যে খুঁজে নিচ্ছেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির উপাদান। রবীন্দ্রনাথও লিখে ফেলেছেন, 'কোন অমানুষ/তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল!' শক্তি ও সুন্দরের যাবতীয় ভাণ্ডার যে দেবী দুর্গার মধ্যেই নিহিত তা আরেকবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল 'দুর্গাস্তোত্র'।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রণীত 'দুর্গাস্তোত্র' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরই সম্পাদিত 'ধর্ম' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায়। প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠায় ১লা কার্তিক সোমবার ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৮ অক্টোবর, ১৯০৯ সালে) স্তোত্রটি প্রকাশিত হয়। তখন তিনি কলকাতাতে অবস্থান করছেন, সুতরাং এটি শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপর্বের রচনা। দুর্গাস্তোত্র ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী সনাতনী-চিন্তক প্রবুদ্ধজনের কাছে একটি অন্যতম সৃষ্টি, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা- সংগ্রামী যুবকদের জপমন্ত্র। দেবী দুর্গা এখানে দেশজননীরূপে প্রতিভাত। তা সত্ত্বেও স্তোত্রটির বক্তব্য-বিন্যাস 'মানব-আস্পৃহার শ্রেষ্ঠতম সম্ভার' করে তুলেছে।

যখন তিনি লেখেন সকল কাজেই চিরায়ত দুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়তার কথা, তিমিরবিনাশী আভায় সমষ্টিগত প্রগতির পথ হিসেবেই তা স্বীকৃত হয়ে ওঠে লোকায়তিক জীবনে, 'বীরমার্গপ্রদর্শিনী, এস! আর বিসর্জ্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।' প্রেক্ষাপট বঙ্গদেশ হলেও, বঙ্গের তরুণদলের একাত্ম প্রার্থনা হলেও, তা আসলে ভারত-বাণী; তা আসলে বিশ্বজননীর ঐক্যবোধ। মা দুর্গা এখানে কখন যেন বঙ্গভূমি অতিক্রম করে ভারতমাতা হয়েছেন, হয়ে উঠেছেন জগদম্বে। আজও যখন বাঙ্গালি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে জাতীয় বিকাশের ধারাপাতে, নানান চোরাস্রোতে তলিয়ে যাচ্ছে তার যাবতীয় ক্ষাত্রবল, ভীরু পলায়নপর জাতি হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে অনুক্ষণ, তখন বাঙ্গালি যেন পুনর্পাঠ করে দুর্গাস্তোত্রের টেক্সট। আর নিমেষে শক্তিমান হয়ে অশুভশক্তির টুঁটি চেপে ধরতে পারে।

দুর্গাস্তোত্র :

মাতঃ দুর্গে!
সিংহবাহিনী
সর্ব্বশক্তিদায়িনী মাতঃ
শিবপ্রিয়ে! তোমার
শক্ত্যংশজাত আমরা
বঙ্গদেশের যুবকগণ
তোমার মন্দিরে আসীন,
প্রার্থনা করিতেছি,— শুন,
মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই। এইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্যে ব্রতী আমরা, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, সহায় হও।।

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনী, ত্রিশূলধারিণী, বর্ম্ম-আবৃত-সুন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনী! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে উৎসুক। শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে। বলদায়িনী, প্রেমদায়িনী, জ্ঞানদায়িনী, শক্তিস্বরূপিণী ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিণী! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার

প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।

মাতঃ দুর্গে! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি মাতঃ, গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমিরবিনাশী আভায় ঊষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর।।

মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সর্ব্বসৌন্দর্য্য-অলংকৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি এতদিন শক্তিসংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে, এস, মাতঃ, প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে, তোমার প্রভাবে, মহৎ কার্য্যের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয়।।

মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণী, নৃমুণ্ডমালিনি দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবী অসুরবিনাশিনি! ক্রূর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ভারত ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎপ্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসংকল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই।।

মাতঃ দুর্গে! যোগশক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য্য-সন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তিশ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যজ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগতকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গতিনাশিনী জগদম্বে, প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধাবিঘ্ন নির্ম্মূল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে, গগন-সহচর পর্ব্বততলে, পূতসলিলা নদীতীরে একতায়, প্রেমে, সত্যে, শক্তিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, বিক্রমে, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব অশুভবিনাশী তরবারি তব অজ্ঞানবিনাশী, প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকদের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘুরাও, জ্ঞানদীপ্তিপ্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জ্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও।।

বীরমার্গপ্রদর্শিনী, এস! আর বিসর্জ্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্বকার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা মাতঃ, ঊর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।

তথ্যসূত্র :

১. দুর্গাস্তোত্রের অনুবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমের ওয়েবসাইট থেকে।

২. ত্রিজ রায় লিখিত (২০০৯) শ্রীঅরবিন্দের 'দুর্গাস্তোত্র' প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির কলকাতা, পৃ. ৫-৪০।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

শারদোৎসব নয় দুর্গাপূজা

বরুণ মণ্ডল

'আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না। আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না— পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আজকের নিবন্ধের জন্য যথার্থ। আকাশে বাতাসে আজ শারদীয়া দুর্গাপূজার আবহ রচনা হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনে হোর্ডিং-এ স্থান পাচ্ছে 'শারদোৎসব' শব্দ বন্ধন। কিন্তু এই শব্দ বন্ধনের অর্থটা কী? শরৎকালে যে উৎসব হয়? শরৎকালে তো অনেক উৎসবই হয়; তবে দুর্গাপূজাকে কেন 'শারদোৎসব' নামে অভিহিত করা হচ্ছে? 'দুর্গোৎসব' তবুও শাস্ত্র সম্পৃক্ত শব্দ।

হিন্দু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ কোনোটাই শাস্ত্র বহির্ভূত নয়। মানব জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি প্রচলন করা হয়েছে। দেব-দেবী আরাধনার প্রস্তুতি, উপাচার, রীতিনীতি, মন্ত্র সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা আছে। এবং সবই যুক্তি নির্ভর। লৌকিক বা বাহ্যিক কিছু নয়। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হিন্দুধর্মের যেগুলো লৌকিক রীতিনীতি বলে ভাবা হচ্ছে, তার পিছনেও সুগভীর কারণ লুক্কায়িত রয়েছে। স্পষ্টত বোঝা যায় হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার সবই বিজ্ঞান ও ধর্মের মেলবন্ধন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা অনুযায়ী, 'আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না...'। কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুর্গাপূজার নামে আমরা আড়ম্বর করছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করছি না। প্যান্ডেল সজ্জা, আলোকসজ্জা বা থিমের প্রতিযোগিতায় নেমে আসল কাজটা ভুলে যাচ্ছি। অন্যদিকে গাঁটের পয়সা খরচ করে বিধর্মীদের কাছে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভুল বার্তা পাঠাচ্ছি। এ কারণেই নাস্তিকরা প্রশ্ন তুলছে, দুর্গাপূজার নামে কোটি কোটি টাকা খরচ না করে গরিব মানুষকে দেওয়া অনেক ভালো। তাদের যুক্তিটা মন্দ নয়। আসলে আধ্যাত্মিক কারণকে পিছনে ফেলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য দুর্গা পূজার নামের যা হচ্ছে, সত্যিই তা অর্থের অপচয়।

'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'— এই ট্যাগ লাইনের পিছনে যে গভীর চক্রান্ত রয়েছে সেটা সরল-সাদা মনের হিন্দুরা বোঝে না। সবাই সবার ধর্ম যথাযথ ভাবে পালন করছে। শুধুমাত্র হিন্দুরা তাদের ধর্মকে শাস্ত্রের বিধিবিধান থেকে মাঠে নামিয়ে উৎসব বানিয়ে ফেলেছে। প্রভেদটাই এখানে। দুর্গাপূজা সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুদের। হিন্দু শাস্ত্রের শক্তিরূপিণী দেবী মহামায়া। অসুর নিধনের জন্যই তার আবির্ভাব। ১০ দিক থেকে দশ হাতে দেব প্রদত্ত দশটি অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন মহিষাসুরকে এবং বিজয়িনী হয়েছিলেন। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের উৎসব। হিন্দু তত্ত্ব সনাতন ধর্ম যারা মানে না তাদের জন্য দুর্গোৎসব নয়। রবীন্দ্রনাথের কথার মতো আমরা আজ 'যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; আমাদের সামনেই বিধর্মীরা মা দুর্গাকে গালাগালি দেয়! আমরা কয়জন প্রতিবাদ করি? পতিতাপল্লির মাটি না হলে দুর্গাপূজা হয় না। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না জেনে দুর্গাপূজাকে নিয়ে বিধর্মীদের খিল্লি করাকে সমর্থন করি। তাদের অপযুক্তিতে কখনো আমরাও মনে মনে নাস্তিক হয়ে উঠি। বলা ভালো আমরা আমাদের ধর্মকে ধর্মই বলে মনে করি না; তাই সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটাতে পূজা মণ্ডপে বাজিয়ে দিই আজান! যেন সর্বধর্মের ঠেকা নিয়ে বসে আছি আমরা হিন্দুরা। পৌত্তলিকতা বিরোধী মতবাদের আজান আমরা বাজিয়ে দিই পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের মঞ্চে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। সর্বশক্তিমান মহামায়ার সামনে এইসব চিৎকার করে বলার নামই হচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়।

আস্তিকের দুর্গা পূজা কখন যেন নাস্তিকের উৎসব হয়ে গেছে, সংযমের ধর্মীয় দুর্গাপূজা কখন বিনোদনের রঙ্গমঞ্চ হয়ে গেছে। হিন্দুর বড়ো উৎসব দুর্গাপূজা কখন বাঙ্গালির 'শারদ উৎসব' হয়ে গেছে। সংযমের মাতৃ আবাহন কখন মদ মাংস চেটেপুটে খাওয়ার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে হিন্দুরা বুঝতে পারেনি। অসুর দলনের জন্য মহামায়ার আবির্ভাব, আর আজ অসুররাই মহামায়ার পূজার আয়োজন করছে। কলিকাল কিনা! ঘটা করে মহালয়ার দিন থেকেই বিভিন্ন মিডিয়ায় ঘোষণা

করা হয় পিতৃপক্ষ-দেবীপক্ষের কাহিনি। পড়ানো হয় উমার পিতৃ আলয়ে সপরিবারে আগমনের কাহিনি। মেয়ের আগমনে পিত্রালয়ে মহানন্দের সূচনা হবে এখানে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু মেয়ের পিতৃগৃহ থেকে বিদায়কালে পিতৃগৃহে আনন্দের ঢল নামবে, সেটা কি বাড়াবাড়ি নয়? 'আসছে বছর আবার হবে' কর্ণবিদারক ডিজের আওয়াজে মাতালদের সেকি আনন্দোৎসব! অসুর যখন পূজারি হয়ে ওঠে, দুরাত্মারা যখন মহামায়ার আহ্বায়ক হয়ে ওঠে তখন তো এমন পরিবর্তন হবেই। তাই মাকে চোখের জলে বিদায় নয়, মদ মাংস গলাধঃকরণ করে, চটুল গানের সুরে চিৎকার রব ওঠে, 'আসছে বছর আবার হবে।' অর্থাৎ বকেয়া আনন্দ পরের বছরের জন্য তুলে রাখা হলো। অসুরমনা কোনো সাহিত্যিক লিখে ফেলেন, 'বাঙ্গালি ৩৬১ দিন অপেক্ষা করে, চারদিন আনন্দের জন্য!' চারিদিকে শুধু মজা, মজা, আর মজা। ভক্তিভাবের লেশমাত্র নেই। ফলে দিনের পর দিন পূজাপাঠ হয়ে আসছে কিন্তু জগদ্জননী মা, না যশ দিচ্ছে, না জয় দিচ্ছে। ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে 'যশং দেহি, জয়ং দেহি' মন্ত্রোচ্চারণ।

ওদিকে ব্যবসায়ীরা ওত পেতে আছে। ধর্মকে ব্যবসায় পরিণত করে কীভাবে দু'পয়সা কামানো যায়। দুর্গা পূজাকে শাস্ত্রীয় ও ভক্তিভাবের করে রাখলে ব্যবসা লাটে উঠবে। তাই দুর্গাপূজার আবহাওয়ায় উমা মায়ের মুখের ছবি সেঁটে বড়ো বড়ো হোর্ডিং দিয়ে মানুষের মনে দুর্গোৎসবের আগাম আবহ তৈরি করে দেয়। সঙ্গে দেওয়া হয় 'যা দেবী সর্বভূতেষু' গোছের কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র। কাশফুল আর ঢাক ঢাকির ছবি। বাঙ্গালি আনন্দের জন্য উঠে পড়ে। আর আজ তো আনন্দ মানে আত্মার উপভোগ্য বিষয় নয়; আনন্দ মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য বস্তুগত প্রাপ্তি— জামা চাই, জুতো চাই, শাড়ি চাই, গয়না চাই, রূপ চাই, ভোজন চাই। সেজেগুজে মায়ের কাছেও ওই একই প্রার্থনা 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'। পূজার তাৎপর্য, মন্ত্রের অর্থ ও আধ্যাত্মিকতার সম্যক উপলব্ধি ছাড়া। জগৎ জননীর কাছে রূপ চেয়ে, যশ চেয়ে, জয় চেয়ে হবেটা কী? কলির মানুষ পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফলে মায়াবদ্ধ হয়ে নিজেকে ভোক্তা ভেবে ভবসমুদ্রে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। ত্রিবিধ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের শূলবিদ্ধ হয়ে দিন গুজরান করছে। দশ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও দেবাদিদেবের ত্রিশূলাস্ত্রে মহিষাসুরকে বধ করেছেন। ত্রিশূলের মাঝের শূল সত্ত্বঃ গুণের এবং দুই পাশের দুই শূল রজঃ ও তমঃ গুণের দ্যোতক। এই ভব-জ্বালা-যন্ত্রণা নামক অসুরকে সংহার করে কলি জীবনের দুর্গতিনাশ করে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র মহামায়া।

মায়াবদ্ধ জীব তার বদ্ধতার কারণ ভুলে মায়ের আগমন, স্থিতি ও বিসর্জনেও মাতাল হয়ে নিজের চাওয়াটা চেয়ে নিতে ভুলে গেছে। শাস্ত্রের দ্বারা না বুঝে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের দ্বারা মহামায়ার শুভ আগমনের খবর নিচ্ছে হিন্দুরা। শাস্ত্র দুর্গাপূজার প্রকৃত অর্থ বুঝাবে আর ব্যবসায়ীরা অর্থ কামানোর যন্ত্র বানাবে। সেটাই তো হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। রাবণ বিজয়ের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অকালে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মায়ের বোধন করেছিলেন। সেই 'অকালবোধন'ই আজকের শারদীয়া দুর্গাপূজা। এ পূজার প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র। আনন্দে মশগুল ক'জন হিন্দু জানেন সে কাহিনি। অথবা রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে আবার বলতে হয়, 'যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না— পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স...' কী নিদারুণ অবলোকন। দুর্গোৎসব সম্পর্কে আমরা কেউ কেউ হয়তো শাস্ত্রীয় বিশ্বাস করি, কিন্তু তা আমরা ক'জন পালন করি! পরের অনুকরণে আমরা গর্ববোধ করি।

তাই মায়ের পূজার নামে আমরা বুর্জ খলিফা বানাই, হোয়াইট হাউস বানাই, স্থায়ী ও বাস্তব নির্মিত কোনো মন্দিরের অদলে নকল মন্দির বানাই। এভাবেই আমরা পরের অনুকরণ করে গর্ববোধ করি। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মহামায়াকে নিয়ে থিমের লড়াই করি। কেননা শাস্ত্রে বলা রয়েছে, কলির অবস্থান কলহে। শাস্ত্রীয় মহামায়াকে অর্চনা নিয়েও আমাদের কলহে ব্যস্ত থাকতে হয়। কলহে এতটাই অভ্যস্ত যে আগেভাগে সেই কলহ বা কুকর্ম নিবারণের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা করতে হয়। আজকাল তো ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা রাখতে হয়। মহিষাসুর পর্যন্ত যে মাকে ভয় পেয়ে গেছিলেন, সেই রণচণ্ডী মায়ের সামনে আমরা কুকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারি না। এতটাই ভয় ডরহীন। আসলে অশাস্ত্রীয়ভাবে পূজা করতে করতে বা দুর্গাপূজাকে শারদ উৎসব ভাবতে ভাবতেই নাস্তিকের পুতুল পূজায় মেতে উঠেছি। দুর্গা প্রতিমাতে আর মাতৃশক্তি জাগ্রত হয় না। পূজার নামে শুধুই বেলেল্লাপনা, আধুনিক বিজনেস সামিট কিংবা দুর্গা কার্নিভাল, নামে উৎসবে পূজার অনুদানের অছিলায় মাতৃবন্দনা আজ রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স!' আর একদল বুদ্ধি খরচ করে আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে দুর্গাপূজা বাঙ্গালির সেরা উৎসব। কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে একবারও বিচার করিনি, বাঙ্গালি কারা, আর দুর্গাপূজা করে কারা? দুই বঙ্গে যারা বাস করে অথবা বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারা সবাই বাঙ্গালি কী? তবে কেন দুর্গাপূজা এলে মূর্তি ভাঙায় মেতে ওঠে বাংলাদেশ? একমাত্র হিন্দুদের পূজা হলো দুর্গাপূজা। একমাত্র হিন্দু শাস্ত্রে দুর্গাদেবীর অস্তিত্ব এবং পূজার নির্দেশনা দেওয়া আছে। শাস্ত্র পড়তে যাদের অ্যালার্জি আছে তাদের বলব উইকিপিডিয়া খুঁজুন। দেখুন পরিষ্কার লেখা আছে 'হিন্দুর দুর্গাপূজা'।

সুতরাং হিন্দুর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দুর্গাপূজাকে বাঙ্গালির দুর্গাপূজা দেগে দেওয়াটা এক গভীর চক্রান্ত। এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে বাঙ্গালি সংস্কৃতির তথাকথিত কুশীলবেরা। সূক্ষ্মভাবে হিন্দুদের থেকে দুর্গাপূজা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। দুর্গাপূজাতে সব থেকে বেশি হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্মিলিত হয়। সেই ঐক্যবদ্ধতা থেকে দূরে রাখার চক্রান্ত 'বাঙ্গালির শারদোৎসব' প্রচারের দ্বারা। হিন্দু শাস্ত্র বলছে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' নীতি। তাই হিন্দুর দুর্গোৎসব বলার মধ্যে কখনোই সংকীর্ণতা নেই। দুর্গামণ্ডপে আজান বাজিয়ে বিশ্বাস আনতে হবে না, হিন্দুরা প্রতিটি শাস্ত্র বিশ্বাস করে জগতের প্রতিটি জীব সনাতনী, সবই পরমাত্মার সন্তান। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ছলে-বলে-কৌশলে কাউকে গ্রাস করে নিজের মতবাদকে চাপিয়ে দেওয়াটা ঈশ্বরীয় কর্মকাণ্ড নয়, একটা পলিটিক্স। □

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মা দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন

অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

শ্রীরামচন্দ্র যে বাঙ্গালিরও দেবতা, বাঙ্গালিরও উত্তরাধিকার, তার মস্ত বড়ো প্রমাণ, শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন। বসন্তকালে দেবীর বাসন্তী রূপ প্রতিস্থাপন করে বাঙ্গালির কাছে শরতের দুর্গাপূজা হয়ে উঠলো প্রাণের উৎসব। শ্রীরামচন্দ্র যে পথ দেখিয়েছেন, বাঙ্গালি তাকে শিরোধার্য করেছে। অতএব শ্রীরামচন্দ্রকে 'গুটকাখোর খোট্টাদের দেবতা' না বানিয়ে প্রকৃত সত্যটা তথাকথিত বাঙ্গালি মেনে নিক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব বিষয়ে আখ্যান খুঁজে পাওয়া যায়। রাবণ-বধ করবেন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু রাবণ যে দেবী অম্বিকাকে আগেই স্মরণ করে রেখেছেন। রাবণের স্তবে দেবী হৈমবতীর মন আর্দ্র হয়েছে। রাবণের স্তবে দেবী অভয়া অভয়দানও করেছেন।

'স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিল দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ।।'

যুদ্ধে এসে রঘুপতি দেখলেন, রাবণের রথে বসে আছেন স্বয়ং হৈমবতী। নিজের ধনুর্বাণ রেখে দিলেন তিনি, তাঁকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করলেন। ব্যাঘাত ঘটল রাবণ-বিনাশের। তাহলে কী হবে! বিমর্ষ হয়ে ভূতলে বসে পড়লেন। কী উপায়! বিধাতাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। বিধি বললেন, অকালবোধন করে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করতে হবে। দেবরাজ ইন্দ্র বলছেন, দেরি না করে তাই হোক। রাবণ বধের সলতে পাকানো শুরু হলো।

সেই শরতে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বোধন করলেন দেবী দুর্গার, ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ হলো। দেবতাদের সঙ্গে রামচন্দ্র মহামায়ার পূজা শুরু করলেন। নিশা প্রভাত হলো। বিধির বিধান মেনে শ্রীরামচন্দ্র স্নান করে প্রস্তুত হলেন। বনের ফুলে-পল্লবে, ফল-মূলের নৈবেদ্যে সমুদ্রের তীরে পূজায় বসলেন তিনি। চণ্ডীগানও রচনা করলেন।

'পূজি দুর্গা রঘুপতি,
করিলেন স্তুতি-নতি,
বিরচিল চণ্ডী-পূজা গান।'

চণ্ডীপাঠ করলেন নিজেই। দেবীর গীতিনাট্য হলো। বানর বাহিনী জয়ধ্বনি দিল। তারা প্রেমানন্দে দেবীর গুণ বর্ণনাত্মক গান গাইছে। এইভাবে দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামল।

'সায়াহ্নকালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাধিবাসন।।'

শ্রীরামচন্দ্র নিজেই দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে নিয়েছেন। শাস্ত্র নির্ধারিত আচারে দেবীর অধিবাস সম্পন্ন করছেন। দেবী আরাধনার নবপত্রিকা রূপ রচিত হয়েছে। নবপত্রিকার এক একটি উদ্ভিদে এক এক মাতৃদেবীর অধিষ্ঠান। তাঁরা দেবী দুর্গারই রূপভেদ। তাদের সম্মিলিত রূপ এই নবপত্রিকা।

'আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।'

শাস্ত্রের পদ্ধতি ও নিয়ম মেনেই শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। ভক্ত হনুমান ত্রিভুবন ঘুরে সমস্ত উপচার সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন।

'এইরূপে উদ্যোগ করিলা দ্রব্য যত।
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লেখ আছে,

বেদ-বিধিমতে শ্রীরামচন্দ্র সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজা, নবমীবিহিত পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। সঙ্গে ছিল দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীতের আয়োজন।

'শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।

গীত নাট চণ্ডীপাঠে দিবা-অবসান।'

নানান বন্যফল এনে নৈবেদ্য সাজিয়েছে কপিবাহিনী। পূজায় যে সমস্ত ফুল বানরবাহিনী সংগ্রহ করে এনেছিল তার মধ্যে পাওয়া যায় অশোক, কাঞ্চন, জবা, মল্লিকা, মালতী, ধবা, পলাশ, পাটলী, বকুল, গন্ধরাজ, স্থলপদ্ম, কদম্ব, পারুল, রক্তোৎপল, শতদল, কুমুদ, পারিজাত, শেফালি, করবী, কনক-চম্পক, কোকনদ, অতসী, অপরাজিতা, চম্পক, নগেশ্বর, কাষ্ঠমল্লিকা, দোপাটি, জাতি, যূথী, আচিঝাঁটি, দ্রোণপুষ্প, মাধবী, টগর, তুলসী, তিসি, ধাতকী, ভূঁইচাঁপা, কেতকী, পদ্ম, বক, কৃষ্ণকেলি, স্বর্ণ-যূথিকা, বান্ধুলী, আঁধুলী, কুরচি, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া ফুলের নাম।

ষোড়শোপচারে পরমানন্দে শঙ্করী পূজা করছেন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু দেবীর দয়া, আর্দ্রতা কোথায়? দেবী কি বঞ্চনা করবেন তাঁকে! সীতাদেবী কি উদ্ধার হবে না?

'নয়নে বহিছে ধারা অসুখী অন্তর।
কাঁদেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর।।'

কাতর হয়ে পড়েছেন তিনি, তখন বিভীষণ বললেন—

'তুষীতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তরশত নীলোৎপল কর দান।।'

দেবী আরাধনায় লাগবে নীলপদ্মের জোগান! কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?

হনুমান দায়িত্ব নিলেন নীলপদ্ম সংগ্রহ করার। বললেন—

'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
এক দণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল।।'

বিভীষণ জানাচ্ছেন, দেবীদহে একমাত্র নীলপদ্ম ফোটে। শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে হনুমান গেলেন সেখানেই। অষ্টোত্তরশত পদ্ম তুলে দ্রুত এলেন তিনি। গুনে গুনে প্রভুর হাতে দিলেন নীলপদ্ম। শ্রীরাম দেবীকে পদ্ম প্রদান করার সংকল্প করলেন। কিন্তু পরীক্ষা করবার জন্য দেবী আগেই একটি পদ্ম হরণ করে নিয়েছেন।

'করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হরমনোহরা।
হরিলেন আর, এক পদ্ম তাঁর,
মহেশ্বরী পরাৎপরা।।'

এক পদ্মে কমতি হচ্ছে! বিস্মিত শ্রীরামচন্দ্র। সংকল্প তবে কি ভঙ্গ হবে? কী উপায়! পুনর্বার হনুমানকে বলছেন, দেবীদহে গিয়ে আর একটি পদ্ম নিয়ে এসো। হনুমান বলছেন—

'শুন হে গোঁসাই, আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালি।
হেন লয় চিতে, তোমারে ছলিতে,
পঙ্কজ হরিলা কালী।।'

বিড়ম্বনা কাটাতে শ্রীরামচন্দ্র তখন দেবী কালিকার স্তুতি করছেন।

'বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার।'

দেবীর পদতলে কাতর হয়ে পড়ে আছেন রামচন্দ্র। দুঃখিত অন্তরে শ্রীরাম কাঁদছেন। বলছেন, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করবেন তিনি। অবশেষে তাঁর মনে হলো, লোকে তো তাঁকে 'নীলকমলাক্ষ' বলে। এরই একটি তিনি দেবীর কাছে নিবেদন করবেন।

'যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সংকল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল।।
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে।।'

স্তব করতে করতে কাঁদছেন শ্রীরাম। এরপর তিনি তূণ থেকে বাণ নিয়ে চক্ষু উপড়াতে যাবেন, এমন সময় দেবী দুর্গা তাঁর হাত ধরলেন।

'চক্ষু উপড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে।।'

এবার রাবণ বধের জন্য দেবীর আদেশ এল। দেবী বলছেন, পরমা প্রকৃতি জানকীকে হরণ করবে, এ সাধ্য কি রাবণের আছে? আসলে রাক্ষস বিনাশ করাতে সমুদ্রের মাঝে সেতু বাঁধিয়ে সীতা হরণের ছল করে শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে আনা হয়েছে। না হলে রাক্ষস বিনাশ হবে না, আসুরিক শক্তি বধও হবে না! দেবী বললেন,

'অকালবোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলা প্রকাশ।'

এই হলো অকাল বোধনের কাহিনি। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দেবী দুর্গার পূজা করে দশমীর দিন সংগ্রাম করতে চললেন রঘুপতি রাম। যুদ্ধে বিজয়ী হলেন এবং মাতৃশক্তিকে আসুরিক শক্তির কবল থেকে উদ্ধার করে, দানব শক্তির বিনাশ সাধন করলেন। সেই থেকে মর্ত্যে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন হলো। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হয়ে উঠেছে এই দুর্গাপূজাই। তাই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বাঙ্গালি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। □

বালুরঘাটের সাহাবাড়িতে স্থান বদল হয় গণেশ ও কার্তিকের

অজয় সরকার

বনেদি বাড়ির পূজার মধ্যে বালুরঘাটের সাহা বাড়ির পূজাও অন্যতম। প্রায় ১৮১ বছরের পুরনো এই পূজা। এই পূজার প্রতিষ্ঠাতা বনমালী সাহা রায়। তিনি

বাংলাদেশের পাবনা জেলার জামাত্তার বাসিন্দা ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে তিনি জলপথে বালুরঘাটে ব্যবসা করতে এসে স্বপ্নাদেশ পেয়ে বালুরঘাটের বিশ্বাসপাড়া এলাকায় মা দুর্গার পূজা শুরু করেন। সেই থেকে সাহা বাড়িতে দেবী দুর্গার পূজা হয়ে আসছে। বর্তমানে তাঁর উত্তরসূরি কালি কৃষ্ণ সাহা রায় এই পূজা করে আসছেন।

আর পাঁচটা দুর্গা পূজার থেকে সাহা বাড়ির দুর্গার মূর্তি একদম আলাদা। এখানে দেবী দুর্গার স্থান অপরিবর্তিত থাকলেও গণেশ ও কার্তিকের স্থান পরিবর্তন হয়। দুর্গার ডান দিকে গণেশের থাকার কথা থাকলেও বাঁ দিকে থাকে। আবার ঠিক বাঁ দিকে কার্তিকের থাকার কথা থাকলেও দুর্গার ডান দিকে থাকে। এছাড়াও বংশপরম্পরা অনুসারে সাহা বাড়ির দেবীর পূজাতে পুরোহিতরা পূজা করে আসছেন, মৃৎশিল্পীরা তেমনি প্রতিমা তৈরি করে আসছেন।

জানা যায়, বনমালী সাহা যখন এই পূজা শুরু করেন তখন মৃৎশিল্পী অন্য দুর্গা প্রতিমার মতো সাহা বাড়ির দুর্গা প্রতিমা করেছিলেন। কিন্তু পরদিন সকালে সবার নজরে আসে গণেশ ও কার্তিকের স্থান পরিবর্তন হয়ে গেছে। মৃৎ শিল্পী তাদের পুনরায় তাদের স্থান পরিবর্তন করেন। কিন্তু পরদিন সকালে গণেশ ও কার্তিকের আবার স্থান পরিবর্তন হয়ে গেছে দেখে বনমালী সাহা রায় নির্দেশ দেন, এই ভাবেই মায়ের পূজা হবে। সেই থেকে একই নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে সাহা বাড়ির দুর্গা পূজা হয়ে আসছে। এছাড়াও মন্থন ষষ্ঠীতে প্রতিমা তৈরি শুরু হয়। মহালয়ার দিনই মায়ের চক্ষু দান হয় এবং প্রতিমার রং সব শেষ করতে হয়। এই পূজার অন্নভোগ হয় না। এখানে পরমান্ন ভোগ হয়। পূজার কয়েকদিন নিরামিশ খাওয়া হয়।

বনমালী সাহার বর্তমান উত্তরসূরি কালি কৃষ্ণ সাহা রায় ও তার ছেলে প্রীতম কৃষ্ণ সাহা রায় জানান, বনমালী সাহা রায় এই পূজার শুরু করেন। তাঁর সময় থেকে যে ভাবে মায়ের পূজা হয়ে আসছিল, এখন ঠিক একই ভাবে মায়ের পূজা হয়।

পূজার সব দিন মাকে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয় এবং নিজেরাও নিরামিষ খান। এছাড়া মায়ের ভোগ হিসেবে দুধের তৈরি নানা উপকরণ দেওয়া হয়।

মৃৎশিল্পী হিমাংশু মহন্ত জানান, তার বাবা ৫৮ বছর ধরে এই সাহা বাড়ির প্রতিমা তৈরি করে এসেছেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি একাই প্রতিমা তৈরি করছেন বিগত ৭ বছর ধরে। এছাড়াও বাবার সঙ্গে ১৮ বছর ধরে কাজ করেছেন। এখানে গণেশ ও কার্তিকের স্থান পরিবর্তিত। মহালয়ার দিনই প্রতিমার রং করতে হয় আবার এদিন শেষ করতে হয়।

হাওড়া জেলার বালি চৈতল পাড়ার ৩৫৬ বছরের বুড়িমার দুর্গাপূজা

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বুড়িমার পূজা কবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। নদীয়া জেলার চৈতন্যবংশীয় পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায় লঙ্কার (ভট্টাচার্য) জমিদারি পাট্টা পেয়ে বালী গ্রামে বসবাস করতে চলে আসেন। এই ভট্টাচার্য বংশ পরবর্তী সময়ে চৈতল চট্টোপাধ্যায় বংশে পরিণত হয়। যতদূর জানা গেছে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে পণ্ডিত মহাশয় বা তাঁর পৌত্র রাম গোবিন্দ ভট্টাচার্য আটটি চালা নির্মাণ করে তার মধ্যে একটি সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র (টোল) স্থাপন করেন। ওই আটচালা থেকে পূজার নাম আটচালা বাড়ির পূজা বলে পরিচিত। প্রাচীনত্বের কারণে মা দুর্গা পরবর্তীকালে বুড়িমা নামে পরিচিতি পায়। আগে বাড়ির পূজা ছিল এখন সর্বজনীন রূপ পেয়েছে।

কোচবিহারে বড়োদেবীর মূর্তি দুর্গার প্রচলিত রূপ থেকে আলাদা

সাধন কুমার পাল

কোচবিহারের বড়োদেবীর পূজা রাজ্য তথা দেশের অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপূজা।

কোচবিহারের রাজপরিবারের সদস্য ও বিভিন্ন সংগঠনের মতে, কোচবিহারের দেবীবাড়িতে ১৫৩৩ সালে মহারাজা বিশ্বসিংহের আমলে বড়োদেবীর পূজা শুরু হয়। রাজ আমল অবসানের পরে বর্তমানে এই পূজা কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনা করে। বর্তমানে পদাধিকার বলে ট্রাস্টের সভাপতি কোচবিহারের জেলা শাসক। রাজ আমলের সময় থেকে পূজার নিয়ম-আচার সব একই রয়ে গিয়েছে। তবে সেই তুলনায় জাঁকজমক ও আড়ম্বর কমলেও প্রতিবছর এই পূজা দেখতে দেবীবাড়িতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভিড় জমান। কোচবিহারের বড়োদেবীর মূতি দেবী দুর্গার প্রচলিত রূপের থেকে অনেকটাই আলাদা। লাল রঙের বড়োদেবীর রূপ অনেকটাই ভয়াল। মূর্তির মহিষাসুরের ডান হাতে সিংহ এবং বাঁ হাতে বাঘ কামড় দিয়েছে। দেবীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে এগারো ফুট।

রাজ আমলে বড়োদেবীর মুখমণ্ডল ছিল অনেকটা গোল। তিনি ছিলেন হাস্যমুখী। তাঁর উন্নত চিবুক ও ঘন ভুরু ছিল। বড়োদেবীর আয়ুধ ও অলংকারেও পরিবর্তন এসেছে। সেকালে দেবীর মাথার কিরীট ছিল অর্ধগোলাকার অনেকটা পুরাকালের টায়রার মতো। তাঁর ওপরের ডান হাতের খেটকটি ছিল অনেকটা মধ্যযুগের দুর্গামূর্তিগুলিতে প্রাপ্ত ছোটো তলোয়ারের মতো। অসুরের দৃষ্টি ছিল দেবীর দিকে, যা মূর্তিতত্ত্ব অনুযায়ী অত্যন্ত স্বাভাবিক। দেবীর বাহন সিংহের অবস্থান ছিল সামান্য। পিছনদিকে এবং তাঁর গ্রীবা এখনকার তুলনায় অনেকটা খর্বাকৃতি ছিল। মূর্তির নেপথ্যে চালা বা চালচিত্রের ওপর দিকের পরিলেখ ছিল গোল এবং সমগ্র চালচিত্রটি ছিল ভারী অলংকরণযুক্ত। প্রতিমা শিল্পী প্রভাত চিত্রকরের মতে, রাজ আমলের মূর্তিটিতে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি প্রতিসাম্য ছিল।

বড়োদেবীর মূর্তির আসল রূপ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কোচবিহরের দুটি সংগঠনের তরফে দাবি তোলা হয়েছে যে বড়োদেবীর মূর্তির আগের যে আদল, রূপ ও সাজসজ্জা ছিল, বর্তমানে তার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে। অবিলম্বে তা পরিবর্তন করে দেবীর আগের রূপ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে তারা।

গোবরডাঙ্গায় বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা

সুকুমার নাথ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুরাতন পৌরসভা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোরবডাঙ্গা পৌরসভা। এই পৌরসভার মধ্যেই আছে এতদ্ অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার পরিবার। এই জমিদারদেরই প্রতিষ্ঠিত গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ। তাই গোবরডাঙ্গার বনেদি পূজা বলতে জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজাকে বোঝাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিবারের দুর্গাপূজা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই শুরু হয়। পূজা শুরু করেন জমিদার শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়, প্রথম থেকেই এই পূজার প্রতিমা ছিল একচালার। তবে প্রতিমা বেশ বড়ো হতো। পূজাকে ঘিরে কবিগানের আসর বসত। এই পূজার বিশেষত্ব হলো সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে তিন দিনই কুমারী পূজা হয়। প্রথম দিকে বলি প্রথার প্রচলন থাকলেও ১৯৯৭ সাল থেকে বলি নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে অষ্টম পুরুষরাই এই পূজা করছেন। প্রতিমা সেই একচালেরই আছে তবে আকার আকৃতি ছোটো হয়ে গেছে। কিন্তু নিয়মরীতি মেনে শাস্ত্রমতে চারদিনই পূজা হয়।

শান্তিপুর জজপণ্ডিতের বাড়ির দুর্গাপূজা

ড. সুব্রত দাস

নদীয়ার শান্তিপুরের প্রাচীন পূজাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চাঁদুনী বাড়ি, বড়গোস্বামী বাড়ি, রায় বাড়ি, জজপণ্ডিতের বাড়ি, তরফদার বাড়ি, রজনীকান্ত মৈত্র বাড়ি, রায় বাড়ি প্রভৃতি। প্রতিটি বাড়ির পূজাই নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয়তার দিক থেকে বিশিষ্ট। শান্তিপুরের বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজার মধ্যে অন্যতম তর্কবাগীশ লেনের জজপণ্ডিত বাড়ির দুর্গাপূজা সম্পর্কে। এই পূজা প্রচলন করেন স্বর্গীয় পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে জজপণ্ডিত উপাধি পেয়েছিলেন। তর্কবাগীশ বা তর্করত্ন উপাধিও তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পান। তাঁর নামেই রাস্তার নামকরণ হয়েছে। এই বাড়িটি শান্তি পুর ডাকঘরের বিপরীতে এবং শান্তি পুর মিউনিসিপালিটির ঠিক পাশেই অবস্থিত।

পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, হাজারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর বর্তমানে তাঁদের বংশধর এবং উত্তরসূরীরা বহু বছরের স্মৃতিবিজড়িত মা-দুর্গার পূজার্চনা করে আসছেন। যদিও পরিবারের বর্তমান সদস্যের কাছ থেকেই জানা গেল তাঁদের বাড়ির কালীপূজা দুর্গাপূজার থেকেও অনেক প্রাচীন। প্রায় পাঁচশো বছর আগের। নাম পক্কান্নেশ্বরী কালী। আর দুর্গাপূজাটি প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো। মা দুর্গর আলাদ কোনো নাম এখানে নেই। বাড়ির বড়ো কন্যা তথা মেয়ে রূপেই এখানে তিনি পূজিতা। আর মাকালী ছোটো মেয়ে রূপে পূজিতা। আমরাও গিয়ে দেখলাম একই বেদীতে বামদিকে কালীপ্রতিমা ও ডানদিকে দেবীদুর্গার চিত্র রাখা রয়েছে। সেখানে ফুল, ঘট ইত্যাদি দেখা গেল। এখানে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে, য সম্পূর্ণ মাটির তৈরি। কথিত আছে একবার মায়ের এই পঞ্চমুণ্ডীর আসন বাঁধাই করে নির্মাণ করার কাজে বাড়ির এক পূর্বপুরুষ উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁর আদেশানুসারে শ্রমিকরা কাজ শুরু করার পর বিভিন্ন ভৌতিক কাণ্ডকারখানায় ভীত হয়ে তারা পালায়। এভাবে অনেকেই ওই কাজ করতে এসে পলায়ন করায় তিনি নিজেই একদিন কোদাল সহযোগে ওই বেদী বাঁধাই করতে যান। বেদীতে একটি কোপ পড়ামাত্র তিনি সেই স্থানেই মারা যান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। সেই থেকে বেদীর চারপাশ বাঁধানো হলেও প্রধান বেদীটি আজও গোবর এবং মাটি দ্বারা নির্মাণ করা হয় প্রতিবছর। ঠাকুরদালানের সামনে রয়েছে বাদ্যকরদের জন্য আলাদা ভবন। যদিও সেটি বর্তমানে অনেকটাই ভেঙে গেছে।

আগমনীর আবাহন এখানে হয় রথযাত্রার পুণ্য তিথিতে পটপূজার মধ্যে। দেবীমায়ের প্রতিমায় যেটা বিশেষত্ব দেখা গেল সেটা হলো এখানে পুত্রকন্যা-সহ দেবী পূজিত নন। কেবল মহিষাসুরমর্দিনী দেবীদুর্গার এখানে পূজা হয়। এই বাড়ির প্রতিমা তৈরি করে আসছেন অজিত কুমার পালের বংশধরা। ডাকের সাজ নয় শোলার সাজই এখানকার দেবীমায়ের পছন্দ। এক সময় বড়ো বড়ো নৌকায় মায়ের ভোগের সরঞ্জাম আসত। মায়ের পূজায় দূরদূরান্ত থেকেও পরিবারের সমস্ত আত্মীয়েরা আসেন। সব মিলিয়ে পূজার পাঁচট দিন পরিবার ও এলাকাবাসীদের অনন্দেই কাটে।

পূজা হয় শাক্তমতেই। পাশেই পঞ্চবটী আছে। সেখানে মায়ের বোধন বেলগাছের নীচেই হয়। তবে কল্পারম্ভ হয় সপ্তমীতে। পূজার ভোগে সপ্তমীতে নিরামিষ, অষ্টমীতে ইনিলশমাছ, নবমীর দিন কচুশাক-সহ ১৭ রকমের ভোগ দেওয়া হয়। দশমীতে দেওয়া হয় পান্তাভাত। পরিবারের সদস্যরাই জানালেন তাঁরা মূলত যা খেতে ভালোবাসেন সেটাই মাকে তাঁরা নিবেদন করেন। এই পরিবারের সদস্য গৌতম কুমার চট্টোপাধ্যায় জানালেন, এক সময়ে এখানে মোষ, পাঁঠবলি হতো। বলির পুরনো খাঁড়া যদিও তাঁদের সংগ্রহে নেই। নকশাল আমলে বেশিরভাগ খাঁড়াই লোপাট হয়ে গেছে বলে তিনি জনালেন। এখন কুমড়ো, আঁখ বলি হয়। মহিষবলির হাঁড়িকাঠটি কেবল কালের চক্রে আজ ভঙ্গুর অবস্থায় বিদ্যমান। পৌরোহিত্যের কাজ আগে বাইরের ব্রাহ্মণেরা করলেও বর্তমানে পরিবারের সদস্যরাই পৌরহিত্যের দায়িত্ব সামলান। দেবীর নিরঞ্জন হয় শান্তিপুর মতিগঞ্জের ঘাটে। □

বারুইপুর জমিদার বাড়ির সাবেকি দুর্গাপূজা

ড. মানবেন্দ্র নস্কর

চারদিকে যখন থিমপূজার রমরমা তখন বনেদি বাড়ির পূজা আমাদের নিয়ে যায় শিকড়ের কাছাকাছি। স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সাবেকিয়ানার কথা। বারুইপুর রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজা তেমনই এক সাবেকি দুর্গাপূজা। যে পূজা বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিধন্য। নয় নয় করে ৩২৫ বছরের পুরোনো পূজা। রায়চৌধুরী বাড়ির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে মদন রায়ের বংশধর রাজবল্লভ রায়ের স্মৃতি। এই পরিবারের বংশধর অমীয় রায়চৌধুরী একান্ত আলাপচারিতায় জানালেন, 'তাঁর পূর্বপুরুষগণ নাকি উজ্জয়িনী থেকে এসে দক্ষিণবঙ্গের আদিগঙ্গার তীরে রাজপুরে বসতি স্থাপন করেন। মদন রায় ছিলেন সম্ভবত এই বংশের আদিপুরুষ। যশোর রাজ প্রতাপদিত্য তাঁকে 'মল্ল' এবং মুর্শিদকুলি খাঁ 'রায়' উপাধি প্রদান করেন। বিদেশি তুর্কি আক্রমণকারীদের বাধাদানকারী হিসেবে মদন রায় মহাবীর ছত্রপতি শিবাজীর মতোই অহিন্দু লেখকদের কটূক্তিভাজন হন। তিনিই প্রথম বাড়িতে দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন।

মদন রায়ের জীবনাবসানের পর তাঁর জমিদারি দুই পুত্রের মধ্যে বণ্টিত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র পরশুরাম পান দশ আনা অংশ, কনিষ্ঠ পুত্র শ্যাম ছ'আনা অংশ। তাঁরাই রাজপুরে দশানি ও ছয়ানি রায়চৌধুরী পাড়ার স্রষ্টা। সে সময় বারুইপুরে ছিল মদন রায়ের কাছারি। এই কাছারি সংলগ্ন জমিতে ছিল ইংরেজ নীলকরদের ও প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি। মদন রায়ের উত্তরসূরি রাজবল্লভ রায়ের পৌত্র রাজকুমার রায় (১৮১৫-১৮৭০) সেই কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন। রাজবল্লভকে ইংরেজরা 'চৌধুরী' উপাধি দেন।

'দশানি' ধারায় শ্রীরামের প্রপৌত্র রাজবল্লভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোপে রাজপুর ছেড়ে বারুইপুরে নতুনভাবে জমিদারির পত্তন ঘটান। ১৮০৭ সালে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির আদলে রবীন্দ্রভবনের কাছে একটি এবং ১৮১০ সালে বারুইপুর রাসমাঠের উত্তর দিকে ২২/২৩ বিঘা জমির ওপর 'রাজবল্লভ ভবন' নামে আর একটি দ্বিতল অট্টালিকা গড়ে তোলেন। এই বাড়িটিতে টাস্কান স্তম্ভ ও অর্থগোল খিলানের ব্যবহার হয়েছে। ম্যাকিনটোস বার্ন কোম্পানি এই বাড়িটি তৈরি করে। প্রবেশ পথের ডানদিকে ঐতিহাসিক রাসমাঠ ও নহবতখানা। এই মাঠে 'হিন্দু মেলা', 'স্বদেশি মেলা' উদ্‌যাপিত হয়। বামদিকে বৃহদাকার ঝিল। দেউড়ি ও ফটকের আগে জীর্ণপ্রায় প্রবেশ দ্বার। দেউড়ির পর ভিতরে দক্ষিণমুখী দুর্গাদালানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধগোল পঞ্চখিলান গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভ। কড়ি-বরগা-টালির দুর্গাদালানটি ঔপনিবেশিক স্থাপত্য তথা পঙ্কের কাজের এক অনবদ্য নিদর্শন।

রায়চৌধুরীরা জমিদারি হারিয়ে বর্তমানে সাধারণ গৃহস্থে পরিণত। তথাপি বনেদিয়ানা ষোলো আনাই থেকে গেছে। বাড়ির সাবেকি দুর্গাপূজায় তা প্রতিফলিত। প্রতিমার গঠনশৈলী বা আঙ্গিকেও প্রাচীন রীতিই বর্তমান। একচালা সাবেকি রীতিতে ডাকের সাজে প্রতিমা সজ্জিতা হন। নীমকাঠের কাঠামোটিকে এখনও বহাল রাখা হয়েছে। মহালয়ার ঠিক পরেরদিন প্রতিপদ ও বোধন পূজা। পূজা হয় বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী। পঞ্চমীর দিন চক্ষু দান। ষষ্ঠীর দিন দালানের সামনে বেলতলায় দেবী পূজিতা হন। তারপর দুর্গাদালানে আসেন। মহাসপ্তমীর দিন পুকুরে স্নান না করিয়ে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসা গঙ্গাজলে নবপত্রিকার স্নানকার্য সম্পন্ন হয়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ মতে পূজা পরিচালিত হয়।

রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজার বিশেষত্ব হলো--- ১০৮টি পদ্ম দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হয়। সন্ধিপূজায় ১০৮টি প্রদীপ প্রজ্বলন ও নবমীতে হোম-যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখার মতো।

পূজায় বলিদান প্রথার চল রয়েছে। সপ্তমীর দিন ১টি, মহাষ্টমীতে ৯টি ছাগ বলির পর আখ, চালকুমড়ো বলির রীতি প্রচলিত। নবমীর দিন 'অন্নকুটের' ব্যবস্থা হয়। আনন্দময়ী মা এখানকার নিত্যসেবায় সেবিত হলেও শারদীয়া দুর্গোৎসবের চারদিন দুর্গাদালানে দেবী দুর্গা মহাধুমধামে পূজিতা হন। দশমীর দিন ঘট বিসর্জনের আগে কনকাঞ্জলি প্রদান, বরণ, মহিলাদের সিঁদুর খেলার পাশাপাশি নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর প্রথা আজও স্বমহিমায় পালিত হয়।

পূজা পালিত হয় গভীর ত্যাগ, সাধনা ও শৃঙ্খলার পরিমণ্ডলে। পূজা সম্পন্ন হয় বংশধর অমিয় রায়চৌধুরীদের তত্ত্বাবধানে। প্রতিমাশিল্পী, পূজারি, ঢাকি, ভারি, প্রত্যেকেই বংশপরম্পরায় রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

রাষ্ট্রবাদী আদর্শের মহান ধারা স্বস্তিকা-র মতো জাতীয়তাবাদী পত্রিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকুক : মোহন ভাগবত

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে বেলুড়মঠের স্বামী অভেদানন্দ সভাগৃহে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনজীর প্রাস্তাবিক ভাষণে প্রতিফলিত হয় এক বিশ্বজনীন জীবন দর্পণ। বিশ্বে বর্তমানে জারি থাকা যে অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও বামপন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় শাসন, আইন, ভারতের ধর্ম, আধ্যাত্মিক চেতনা, সব কিছুই পরোক্ষে প্রভাবিত হচ্ছে, এমনকী আক্রান্ত হচ্ছে আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক-ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশ। এই কারণে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় সমাজ থেকেই একমাত্র তার প্রতিবাদ ও সর্বাঙ্গীণ প্রতিরোধ সম্ভব —এই তত্ত্ব মোহনজীর বক্তব্যে উঠে আসে। রাষ্ট্রবাদী আদর্শের মহান ধারা স্বস্তিকা-র মতো জাতীয়তাবাদী পত্রিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকুক দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও সনাতনী বিচারধারার অনির্বাণ দীপশিখা। স্বস্তিকার লেখক, সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মচারীদের সম্মিলিত, নিরন্তর কর্মযোগের মাধ্যমে চির প্রজ্বলিত থাকুক — এই পথনির্দেশ ও প্রার্থনা তিনি করেন। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে অমৃত মহোৎসব ও স্বস্তিকা সাপ্তাহিকীর ৭৫ বর্ষ পূর্তির কারণে অমৃত মহোৎসবের সাযুজ্য তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেন, স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারত বিশ্বকে ধর্ম প্রদান করবে এবং সেই লক্ষ্যে স্বস্তিকা কাজ করে চলেছে। পূর্ব ক্ষেত্রের সঙ্ঘের কার্যালয় কেশব ভবনের অবস্থান অভেদানন্দ রোডে এবং স্বস্তিকা-র ৭৫ বছর পূর্তির এই কার্যক্রম স্বামী অভেদানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে— এই অভূতপূর্ব সাদৃশ্য তুলে ধরে শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রী মা, এবং বীরেশ্বর স্বামীজী, স্বামী অভেদানন্দজীকে তিনি স্মরণ করেন।

পরিপূর্ণ সভাগৃহে হলো স্বস্তিকা-র ৭৫

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৩ অক্টোবর, ২০২৩ মঙ্গলবার, শ্রীশ্রী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ ধন্য বেলুড় মঠের স্বামী অভেদানন্দ সভাগৃহে সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি মহতী সভা আয়োজিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। বিকেল ৪টে ৪৫ মিনিটে মোহনজী বেলুড় মঠে প্রবেশ করেন। মূল মন্দিরে তিনি শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রী মা, স্বামীজীর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেন এবং সন্ধ্যাকালীন আরতিতে যোগদান করেন।

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে সভাগৃহে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তার আগে সংস্কার ভারতীর ৭ জন শিল্পী 'ধন্য ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'— উদ্বোধনী সংগীত-সহ বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

সাড়ম্বরে পালিত বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পূজনীয় মোহনজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, স্বস্তিকা ৭৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী সৌরভ ঘোষ, স্বস্তিকা-র প্রকাশক ও মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং স্বস্তিকা-র পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য।

উদ্বোধনী সংগীত শেষ হওয়ার পর পূজনীয় মোহনজী ও মঞ্চাসীন অন্যান্যরা ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। এরপর মঞ্চে উপস্থিত সদস্যদের পরিচয়পর্ব হয় এবং তাঁদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

এরপর সৌরভ ঘোষ স্বাগত ভাষণ দান করেন। তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রবাদী পত্রিকা হিসেবে গত ৭৫ বছরে স্বস্তিকা-র উত্তরণের ইতিহাস এবং স্বস্তিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের সাহিত্য গুণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর প্রকাশ ঘটে। তাঁর ভাষণের পর স্বস্তিকা-র পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিতব্য 'স্বস্তিকা ৭৫' নামক স্মারক গ্রন্থটির ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে— বিগত ৭৫ বছরে দেশ ভাগ, পূর্ব বঙ্গে হিন্দু নির্যাতন, উদ্বাস্তু

শিষ্ট
তিথি

সমস্যা, জরুরি অবস্থা, অনুপ্রবেশ, শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের মতো অস্থির সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় পটচিত্র লেখার আকারে কীভাবে জাতীয়তাবাদী পাঠককুলের কাছে পৌঁছেছে, স্বনামধন্য লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের কলম কীভাবে প্রতিনিয়ত গর্জে উঠেছে, কীভাবে স্বস্তিকা ভারতীয়, হিন্দু জীবন ও জীবন-দর্শনকে অবিরামভাবে তার প্রতিটি পাতায় তুলে ধরেছে তা বলেন।

তাঁর ভাষণের পর আকাশবাণী, কলকাতার সঞ্চালক ও ঘোষক প্রবীর ভট্টাচার্য ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মাষ্টমীর দিন প্রকাশিত স্বস্তিকা-র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'সম্পাদকীয় প্রতিবেদন'-টি পাঠ করেন। এরপর স্বস্তিকা ৭৫ বছর উদ্‌যাপন সমিতির সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী উদ্‌যাপন সমিতির প্রতিবেদন পাঠ করেন।

অভিজিৎ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রতিবেদন পাঠের পর পূজনীয় মোহনজী 'www.swastikprakashan.org' নামক স্বস্তিকা-র অনলাইন নিউজ পোর্টালের উদ্বোধন করেন। এরপর ১৯৪৮ থেকে ২০২৩ অব্দি— ৭৫ বছরে স্বস্তিকা-র যাত্রা ও ক্রমবিকাশ, আধ ঘণ্টার একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। এরপর পূজনীয় মোহনজী ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৭৫ জন স্বনামধন্য লেখকের নির্বাচিত লেখনী সমৃদ্ধ 'স্বস্তিকা ৭৫' শীর্ষক স্বস্তিকা স্মারক গ্রন্থটির লোকার্পণ করেন। এরপর স্বয়ংসেবক কল্যাণব্রত ভট্টাচার্য তাঁর কণ্ঠে 'সবাই যখন ঘুমিয়েছিল অন্ধকারে আপন ভুলে, হে বিবেক' —এই একক গীতটি পরিবেশন করেন।

এরপর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহনরাও ভাগবত তাঁর বহু প্রতীক্ষিত বৌদ্ধিক বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেন।

তাঁর বক্তব্য সমাপ্তির পরে স্বস্তিকা-র প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল সবার উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবার যোগদানে এই মহতী সভা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কারণে সভায় উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে এবং মঞ্চে উপস্থিত সকল সম্মাননীয় অতিথিবর্গকে তিনি ধন্যবাদ জানান। তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভায় শিবেন্দ্র ত্রিপাঠির কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরম্ গানের সঙ্গে সভায় উপস্থিত সকলে একত্রে গলা মেলান। বন্দেমাতরম্ গানের ধ্বনিতে মুখরিত হয় সভাগৃহ। রাষ্ট্রগীত শেষ হলে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। অধ্যাপক ড. রবিরঞ্জন সেন এবং শ্রীমতী মৌমিত বর সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর প্রান্ত বৈঠক

সংস্কার ভারতীর প্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো গত ২৩, ২৪ সেপ্টেম্বর, শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলোনির সারদা শিশু তীর্থে। এই বৈঠকে আগামী দিনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন— প্রান্ত সভাপতি বিপ্লব দেব, কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় নন্দী, সহ-সভাপতি ভূপেন্দর নাথ বর্মা, মণিকা সরকার। প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক সহ-সম্পাদক সৌমিত্র কুণ্ডু, বিপ্লব দে, কোষাধ্যক্ষ কিশোর কুমার সরকার, প্রান্ত মাতৃশক্তি প্রমুখ শুক্লা অধিকারী, সহ-মাতৃশক্তি প্রমুখ, অঞ্জলি চৌধুরী কর্মকার, নৃত্য বিধাপ্রমুখ সঞ্চারী সরকার, লোককলা প্রমুখ অপর্ণা বর্মা, প্রাচীন কলাপ্রমুখ ক্ষেত্রমোহন সিংহ, সদস্য লক্ষ্মণ পাণ্ডে, রঞ্জিত দাস, শিলিগুড়ির সভাপতি দীপোজ্জ্বল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধ দাস। শেষের দিনে এই বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে নতুন উদ্যোমে কাজ করার জন্য পথনির্দেশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়।

আগামীতে গোটা উত্তরবঙ্গ প্রান্তে সংস্কার ভারতীর কাজের ব্যাপক বিস্তারের যোজনা করা হয়।

বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র ও লোকপ্রজ্ঞার যৌথ অনুষ্ঠান

অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রে গত ১ অক্টোবর, রবিবার সকাল ১০-৩০ থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হলো লোকপ্রজ্ঞার ষোড়শ অনুভব দর্শনের কার্যক্রম। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫০ জন সদস্য একত্রিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মর মূর্তিতে মাল্য অর্পণ এবং বন্দে মাতরম্ সংগীতের দ্বারা শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। ঋষি বঙ্গিমচন্দ্রের পদধূলি ধন্য

জন্মভিটা পরিভ্রমণ, বুনিয়াদি রাধাকৃষ্ণের ঠাকুরবাড়ি এবং বঙ্কিম ভবনের স্মৃতি সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত বস্তুসামগ্রী অনুভব দর্শন করা হয়। দুপুরের ভোজনের ব্যবস্থাও এই পুণ্য ভিটায় আয়োজিত ছিল।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্ব ক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ। অনুষ্ঠানের পরবর্তী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা প্রফেসর ড. রতন কুমার নন্দী। এছাড়াও বন্দে মাতরম্ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এই গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা- সহায়ক পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়। এই বক্তব্যের শেষে প্রশ্নোত্তরের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাঁটাল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রণব বর। পরবর্তী এবং অন্তিম বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর পূর্ণ বন্দে মাতরম্ সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মহালয়ার তর্পণ

রবিব্রত ঘোষ

পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের সন্ধিক্ষণকে বলা হয় মহালয়া। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে পিতৃপক্ষ বলে। পুরাণ মতে ব্রহ্মার নির্দেশে পিতৃপুরুষেরা এই ১৫ দিন পৃথিবীর কাছাকাছি চলে অসেন। তাই ১৫ দিন পিতৃপুরুষদের তর্পণ করা হয় বলে এই মহাক্ষণকে বলা হয় মহালয়া।

মহালয়া শব্দটির অর্থ মহান আলয় বা আশ্রয়। এই দিনটি থেকেই দেবী দুর্গা অসুরকে বধ করার দায়িত্ব হাতে পান। লোককথায় বলা আছে মহালয়ার দিন থেকেই কৈলাস পর্বত থেকে দেবী যাত্রা শুরু করেন মর্ত্যধামে তার বাবার বাড়ির দিকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার লয় প্রাপ্তি ঘটলে তাকে বলা হয় মহালয়া। নিরাকার ব্রহ্মের আশ্রয় হলো মহালয়া।

আরেকটি দিক থেকে বলা হয় মহ। আরেকটি অর্থ হলো প্রেত। অর্থাৎ প্রেতের আশ্রয়। সনাতন ধর্ম অনুসারে এই দিনগুলিতে প্রয়াত পিতৃপুরুষদের মর্ত্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাসদেবের লেখায় মহালয়া বলতে পিতৃলোককে বোঝানো হয়েছে। সেখানে বিদেহী পিতৃপুরুষেরা অবস্থান করেন। আর এই পিতৃপুরুষদের স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানই হলো মহালয়া।

মহালয়া নিয়ে পুরাণে আরেকটি কাহিনি আছে। যা সমুদ্রমন্থনের সঙ্গে যুক্ত। এতে বলা হচ্ছে সমুদ্রমন্থনের পর অমৃত উঠে এলে, সেই অমৃত ভাগ নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। দেবতাদের আহ্বানে দেবী মোহিনীর আবির্ভাব হয়। দেবী মোহিনী অসুরদের জিজ্ঞাসা করেন যে অচেনা এক নারীকে দিয়ে অমৃত ভাগ করলে তাদের কোনো আপত্তি আছে কিনা? মোহিনীর রূপে মগ্ন দৈত্যরাজ বলী বলে বসলেন দেবীর মহৎ আলয়ে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। যার অর্থ তাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে মোহিনীর উপর। মোহিনী দেবীকে দেবতারা মহালয়া তিথিতে আরাধনা করেছিলেন।

মহালয়া দিনটি তর্পণের দিন হিসেবে খুবই পরিচিত। তর্পণ কথার মানে তৃপ্ত করা, খুশি করা। ব্রহ্মার নির্দেশে যে সমস্ত প্রয়াত পূর্বপুরুষ মর্ত্যভূমিতে নেমে আসেন, তাদের উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রজন্মের বংশধররা কিছু না কিছু দান করেন; অন্তত এক অঞ্জলি ভরা জল দেওয়া হয়, তাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের অভীষ্ট লাভ করতে সাহায্য করবেন, আমাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ করবেন এটাই হচ্ছে বিশ্বাস। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে— তৃপ্যান্তি পিতরো যেন তৎপনয়— অর্থাৎ পিতৃপুরুষেরা যে বস্তু প্রদানে প্রসন্ন হন তাই তর্পণ।

যজুর্বেদে তর্পণের মন্ত্র হলো ওম আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইম গৃহন্ত্ব পোহঞ্জলি— আমার পিতৃগণ আসুন অঞ্জলি পরিমিত জল গ্রহণ করুন। রামায়ণ ও মহাভারতে তর্পণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে বলা হয়েছে এই মহালয়ার দিনে, শ্রীরামচন্দ্র পিতা দশরথ ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন।

মহাভারতে কর্ণকে কেন্দ্র করে একটি উপাখ্যান আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হবার পর, কর্ণ স্বর্গে গিয়ে দেখছেন তাকে আপ্যায়ন করার জন্য প্রচুর সোনদানা ও রত্ন রেখে দেওয়া হয়েছে। বিস্মিত কর্ণ, জানতে চাইলেন কেন এটি করা হয়েছে? তার উত্তরে যমরাজ (এটা নিয়ে দ্বিমত আছে কোথাও কোথাও ইন্দ্রর উল্লেখ আছে) বললেন তিনি মর্ত্যে থাকার সময় মানুষকে সোনাদানা, রত্ন অর্থ অনেক কিছুই দান করেছেন কিন্তু পিতৃপুরুষের জন্য জল দান করেননি, তাই তাকে খাবার হিসেবে সোনাদানা দেওয়া হয়েছে। কর্ণ উত্তরে বললেন, আমি আমার পিতৃপরিচয় জানতাম না তো কিছু দান করবো কী করে? তখন কর্ণকে ১৫ দিনের জন্য স্বর্গ থেকে ছুটি দেওয়া হলো। তিনি ফিরে এলেন মর্ত্যে, পূর্বপুরুষদের জন্য জল দান করলেন তর্পণ বিধি অনুসারে, তারপর স্বর্গে গিয়ে উপযুক্ত সমাদর পেলেন। তর্পণ মূলত কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা কেউই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নই যে ঐতিহ্য ও বংশপরম্পরা আর আমরা বহন করে নিয়ে চলেছি। আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে তর্পণ।

এই কৃতজ্ঞতা যে শুধুমাত্র নিজের পিতৃপুরুষের জন্য তা কিন্তু নয়, সমগ্র জগতের জন্যই এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কথা বলা হয়েছে তর্পণ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। তর্পণের বিধিতে লক্ষ্মণ তর্পণ বলে একটি অনুষঙ্গ আছে। লক্ষ্মণের হাতে অত সময় ছিল না, শ্রীরামের সেবায় তাকে তৎপর সর্বদা থাকতে হতো তাই লক্ষ্মণের জন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততম তর্পণ বিধি আছে। সেখানে বলা হচ্ছে ব্রহ্ম থেকে তৃণ— আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত জগৎ তৃপ্যতু, সর্ববৃহৎ থেকে একদম হীন এবং পদদলিত সবাইকার জন্য আমি তর্পণ করছি। সকলেই তৃপ্ত হন।

এই কথা বলার মধ্যে দিয়ে কেবল আত্মকেন্দ্রিকতার বিসর্জন করা হচ্ছে তা নয়, সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। ▯

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা

মদনমোহন সিংহ

১৮৯৪ সালে স্বামীজী আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দজীকে লিখছেন, 'বাবুরামের মা'র বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা (শ্রীশ্রীমা) ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড়ধন, দাদা জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গামাকে যে দিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব, তোমরা জোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি।'

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজী পূর্ববঙ্গ ও অসমে তীর্থদর্শনে যান। ১৯০১ সালে মে মাসে সেখান থেকে ফিরে তাঁর মনে দুর্গাপূজার সংকল্প জাগে। শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, 'এবার ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পুজো করব'। মুখে বললেও আশ্বিন মাস অবধি কোনো আয়োজন কিন্তু করেননি। সে সময় ঘটল এক বিচিত্র ঘটনা। মহালয়ার আগের দিন স্বামীজী নৌকা করে কলকাতা থেকে মঠে ফিরছেন, হঠাৎ দেখলেন যেন মঠে দুর্গাপূজা হচ্ছে— দেবীর প্রতিমা চারিদিকে আলো করে শোভা পাচ্ছে। কাছাকাছি সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীরও এক অদ্ভুত দর্শন হয়। তিনি দেখেন, দেবী দুর্গা যেন দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে এসে একেবারে বেলুড়মঠের বেলতলায় উঠলেন। মঠে এসে স্বামীজী বললেন, 'এবার মঠে প্রতিমা এনে দুর্গোৎসবের আয়োজন কর'। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী দুদিন সময় চেয়ে নিলেন। এদিকে সাধু-ব্রহ্মচারীরা কিন্তু স্বামীজীর সাধ শুনে উৎসবের আয়োজনে লেগে গেলেন।

মহালয়ার দিন (১২ অক্টোবর) স্বামীজী বিকেলবেলা বেলতলায় বসে বোধনের গান ধরলেন— 'গিরি গণেশ আমার শুভকারী'। তার পরদিন সকালে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী প্রেমানন্দজীর সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজন নিয়ে নানা আলোচনা করতে লাগলেন। স্বামীজীর আদেশ— দুর্গাপূজার সময় শ্রীমাকে নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে, বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্তী জায়গার ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া স্বামীজীর বিশেষ নির্দেশ যে, দরিদ্রনারায়ণদের পরিতোষ করে প্রসাদ দিতে হবে।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল গেছেন কুমারটুলিতে প্রতিমার সন্ধানে। সেখানে একটিমাত্র ফরমায়েসি প্রতিমা ছিল— যাদের

নেওয়ার কথা ছিল, তারা নেয়নি। সে কথা শুনে কুমোর যত টাকা চায় তা দিয়ে প্রতিমাটি নিয়ে আসতে বলেন স্বামীজী। গুরুভাইদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, খরচের জন্য ভাবনা নেই— মহামায়ার ইচ্ছা, তা পূর্ণ হবে। সেদিনই স্বামীজী বাবুরাম মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে বাগবাজারে এলেন। স্বামীজী বলেছিলেন— আমরা তো কপনিধারী, আমাদের নামে পূজা হবে না। সিদ্ধান্ত হয়েছিল— শ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হবে। তাই তাঁর অনুমতি নিতে তাঁরা এলেন বাগবাজারে তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে। অনুমতি প্রার্থনা করলে শ্রীমা সম্পূর্ণ অনুমোদন করে বলেন, হ্যাঁ বাবা, মঠে দুর্গাপূজা করে শক্তির আরাধনা করবে বই কী। শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোনো কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বলি দিয়ো না, প্রাণী হত্যা কর না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।' সেইমতো স্বামীজীর নবমীতে 'রুধির কর্দম' করে পূজার সংকল্প রদ হলো। মঠে পূজার খবর পেয়ে ঠাকুরের গৃহীভক্তরাও সানন্দে আয়োজনে জুটে এলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ওপর ছিল পূজার উপকরণ সংগ্রহের ভার। তাঁর চেষ্টায় ত্রুটিহীন ব্যবস্থা দেখে স্বামীজী খুব খুশি হলেন। সেইসঙ্গে স্থির হয় পূজক হবেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল আর তন্ত্রধারক শশী মহারাজের পিতা কৌল সাধক ভক্তিমান ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য।

১৭ অক্টোবর (৩১ আশ্বিন) বৃহস্পতিবার পঞ্চমীতিথি। কুমারটুলি থেকে নৌকা করে প্রতিমা এনে ঠাকুরঘরের নীচের দালানে (বর্তমান মঠ অফিসের একতলায়) রাখা হলো। প্রতিমা ঢোকানো মাত্র আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, তবে প্রতিমা নিরাপদ দেখে স্বামীজী নিশ্চিত হলেন। মঠের উত্তর দিকে দুর্গাপূজার প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি। আর যাতে ঝড়জলে কোনোরকম ক্ষতি না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

১৮ অক্টোবর, ষষ্ঠী। বর্তমানে যেখানে স্বামীজীর সমাধিমন্দির তাঁর সামনের বেলতলায় বোধন ও আমন্ত্রণ অধিবাস সম্পন্ন হলো। সকলের কণ্ঠে তখন গান--- 'বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন। গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন'। এদিন সন্ধ্যায় শ্রীমাও সঙ্গিনীদের নিয়ে বাগবাজার থেকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে এসে উঠলেন। পূজার সমস্ত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীমা বলেছিলেন, প্রতি বছরই মা দুর্গা এখানে আসবেন।

১৯ অক্টোবর শনিবার, সপ্তমী। প্রতিমা মণ্ডপে অধিষ্ঠিত। কলকাতা থেকে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত পূজা দেখতে এসেছেন। শ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে পূজক ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজারম্ভ করলেন। মন্ত্রের সুললিত উচ্চারণ ও ভক্তিপূর্ণ পূজা দেখে সকলে মুগ্ধ। জাতি-বর্ণ নির্বিচারে সকলেই, এমনকী গোঁড়া ব্রাহ্মণেরাও প্রসাদধারণ করলেন। সদানন্দময় স্বামীজী এদিকে-ওদিকে পায়চারি বা গল্পগুজব করছেন, কখনো ধ্যানসমাহিত হয়ে দুর্গামণ্ডপে বসে আছেন, কখনো-বা গুনগুন করে গান গাইছেন— 'সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী'। হঠাৎ স্বামীজী শ্রীমাকে এসে বললেন, 'মা আমার জ্বর করে দাও' একটু পরেই তাঁর হাড় কেঁপে জ্বর এল। এতে চিন্তিত শ্রীমাকে প্রবোধ দিয়ে স্বামীজী বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্য যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে তবু কোথায় কী ত্রুটি হবে আমি রেগে যাব, বকব, চাই কী দুটো থাপ্পড়ই মেরে বসব, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম কাজ কী থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।'

২০ অক্টোবর রবিবার, মহাষ্টমী। সপ্তমীর রাত থেকে স্বামীজীর জ্বর হওয়ায় সেদিন আর তিনি পূজায় যোগ দিতে পারেননি। মঠে হাজার হাজার মানুষ পূজা দেখতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে এল। কেউ কেউ স্বামীজীকে দর্শন করতে চাইলেও অসুস্থতার জন্য দেখা হলো না। তবু চারিদিকে আনন্দের হাট, সকলেই প্রসাদ পেল। স্বামীজীর সাধমতো দরিদ্রনারায়ণের সেবা হলো।

পরদিন ২১ অক্টোবর, সোমবার। ভোর সাড়ে ছ-টার কিছুক্ষণ পরে সন্ধিপূজা। স্বামীজী মণ্ডপে নেমে এলেন। মুখে অসুখের চিহ্ন মাত্র নেই। পূজার সময় জবা ও বিল্বপত্র দেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, সস্মিত জ্যোতির্ময়। সেদিন যথাবিহিত ন'জন কুমারীকে পূজা করা হলো। পাদ্য, অর্ঘ, শাঁখা, পুষ্পাঞ্জলি ও দক্ষিণা দিয়ে পূজা করে তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন স্বামীজী। এই কুমারীদের অন্যতম ছিলেন গৌরী মা'র প্রিয় শিষ্যা পরবর্তীকালের দুর্গাপুরী দেবী, স্বামীজী এত ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন যে, কুমারীর কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা পরানোর সময় স্বামীজী শিউরে উঠে বলেছিলেন, 'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো'! এই কুমারী পূজাতে শ্রীমাও উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী এক চিঠিতে হরিপদ মিত্রকে লিখেছিলেন, 'বাবাজী শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদ-ভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।' স্বামীজীর আচরণে 'শাক্ত' কী তার যথাযথ প্রকাশ দেখা গেল কুমারী পূজায়।

মহানবমীতে পূজাশেষে শ্রীমার দ্বারা দক্ষিণান্ত করা হলো। স্বামীজী শ্রীমাকে দিয়ে তন্ত্রধারককে ২৫ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালেন।

২২ অক্টোবর, মঙ্গলবার ৫ কার্তিক, বিজয়াদশমী তিথি। বিকেলে দলে দলে লোক আসতে লাগলো প্রতিমা বিসর্জন দেখার জন্য। গঙ্গাতীর লোকে লোকারণ্য, ঢাক ঢোল ইংরেজি ব্যান্ড বাজিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। সেবার দুর্গাপূজায় ১৪০০ টাকা খরচ হয়েছিল।

১৯০১ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা প্রতিবছরের মতো জাঁকজমক করে হয়ে আসছে। বর্তমানে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা বিশ্বের এক আকর্ষণীয় বিষয়। পূজার দিনগুলিতে তিথি মিলিয়ে ঘৃত উপাচারে পূজা দর্শনে ভক্ত যেন মা দুর্গার জীবন্তরূপ বেলুড়মঠে অবলোকন করেন।

পূজার প্রতিদিনই ভক্ত দর্শনার্থীদের খিচুড়ির প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। দশমীতে ঘট নিরঞ্জন পর্বে দেবী দুর্গার শ্রীচরণকমলে বিল্বপত্রে আলতা দিয়ে 'শ্রীশ্রী দুর্গামাতা সহায়' বলে লিখে বিল্বপত্রটি দেবীর শ্রীচরণে ভক্তরা, সন্ন্যাসীরা রাখেন। প্রতিমা গঙ্গাতে শ্রীমায়ের ঘাটে নিরঞ্জন হওয়ার পর পিতলের কলসে গঙ্গাজল ভরে নিয়ে এসে আম্রশাখা সহায়ে গঙ্গাজল সমস্ত ভক্ত দর্শনার্থীদের গায়ে ছেঁটানো হয়। এরপর ভক্তরা একে একে প্রেসিডেন্ট মহারাজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক মহারাজদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন এবং মিষ্টিমুখ করেন। কোলাকুলি এবং আনন্দঘন এক সুন্দর মুহূর্ত ধরা থাকে প্রতি দর্শনার্থী ও ভক্তের মনে।

আগমনী থেকে বিজয়া এক পারম্পরিক উদ্‌যাপন

সুদীপ্ত কর

আনন্দময়ী মায়ের আগমনের জন্য আমরা সারা বছর ভক্তিভরে অপেক্ষা করে থাকি। রথযাত্রা থেকেই শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। আর ক্রমে ক্রমে যতই মহাক্ষণ এগিয়ে আসে, মন ও প্রাণ আহ্লাদিত হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার পরিবর্তনে শরতের আগমনের তারতম্য থাকলেও হৃদয়জুড়ে বাজতে থাকে—

'আজ আগমনীর আবাহনে কী সুর উঠছে বেজে
দোয়েল শ্যামা ডাক দিয়ে যায় বরণের এয়ো সেজে
ঘাসের বুকেতে শিশির নীর ধোয়াবে ও রাঙা চরণধীর
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্যামলা সেজেছে।'

তারপর আপামর বাঙ্গালির সেই নস্ট্যালজিক মহালয়ার চণ্ডীপাঠ শ্রবণ ও তর্পণ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জলদগম্ভীর সেই শ্রুতিমধুর উচ্চারণে মনে আসে আনন্দের জোয়ার। তা সত্ত্বেও বাঙ্গালিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই মহাপূজার উদ্দেশ্য।

দেবী দুর্গার সৃষ্টি মাহাত্ম্য অবলোকন করলে নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হলো, দেবী ভাগবত অনুসারে দুর্গমাসুর ছিল হিরণ্যাক্ষ বংশের হিংস্র অসুর। তার পিতার নাম রুরু। দুর্গমাসুর কঠোর তপস্যাবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে বেদশাস্ত্র দখল করে ক্রমে দেবতাদের হীনবল করে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। অশুভ শক্তির প্রভাবে মর্ত্যলোকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা গেলে সকলে দেবী চণ্ডীর দ্বারস্থ হন। দেবী তখন শাকম্ভরী রূপে প্রচুর শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবকুলকে রক্ষা করলে দুর্গমাসুর দেবীকে আক্রমণ করে। দেবী তাকে বধ করে বেদ ও স্বর্গ উদ্ধার করেন। দুর্গমকে বধ করার জন্য দেবীর নাম হয় দুর্গা।

আবার মার্কণ্ডেয়, চণ্ডী ও কালিকাপুরাণে আছে, মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিলে দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে সমস্ত দেবতা সমবেত হয়ে নিজেদের শক্তির দ্বারা তেজপুঞ্জ থেকে উৎপন্ন করলেন অপরাজেয় এক নারীমূর্তির যিনি নিধন করবেন মহিষাসুরকে। তাঁকে শিব দিলেন ত্রিশূল, হিমালয় দিলেন সিংহ, বরুণদেব দিলেন শঙ্খ ও পাশ, অগ্নিদেব দিলেন বর্শা, পবনদেব দিলেন ধনুর্বাণ, দেবরাজ ইন্দ্র দিলেন বজ্র ও ঘণ্টা, যমরাজ দিলেন দণ্ড, ব্রহ্মা দিলেন রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডলু, বিষ্ণু দিলেন চক্র, সময়ের দেবতা কাল দিলেন খড়্গ ও ঢাল, বিশ্বকর্মা দিলেন অভেদ্য কবচ ও কুঠার আর কুবের দিলেন পানপাত্র ও মধু।

এইরূপে তিনি মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন—অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে, ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে এবং দশভুজা দুর্গা রূপে। মায়ের যাওয়া-আসা সম্পর্কে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

গজে চ জলদা দেবী ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে।
নৌকায়াং সর্বসৌখ্যানি দোলায়াং মড়কং ভবেৎ।। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বাহন হাতি ও নৌকা হলে শুভ আর ঘোড়া ও দোলা হলে অশুভ।

মৎস্যসূক্তে বর্ণিত আছে আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে, প্রতিপদ থেকে নবমী এবং শেষে দশমীপূজার ব্যাখ্যা। প্রতিপদে কুণ্ডে (বিশেষ বাণ বা অস্ত্র) পূজা, দ্বিতীয়াতে পুঁথিতে, তৃতীয়াতে খড়্গে, চতুর্থীতে কঙ্কতিকায়ে (চিরুনি),পঞ্চমীতে সূর্যবিম্বে, ষষ্ঠীতে বিল্বমূলে, সপ্তমীতে নবপত্রিকায়, অষ্টমীতে প্রতিমায়, নবমীতে বলিদানের সঙ্গে পূজা এবং দশমীতে প্রণাম করে বিসর্জন। ষষ্ঠীর অর্থ ধর্ম, সপ্তমীর অর্থ পরমার্থ, অষ্টমীর অর্থ বীতকাম হওয়া, নবমীর অর্থ মোক্ষ।

বোধন ও কল্পারম্ভ থেকে শুক্লা ষষ্ঠী পর্যন্ত প্রতিদিন বিল্ববৃক্ষে দেবীর পূজা, দুর্গামন্ত্র জপ ও চণ্ডীপাঠ করা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন দুর্গাপূজায় সাতটি কল্পের বিধান দিয়েছেন, (১) কৃষ্ণনবম্যাদিকল্প, (২) প্রতিপদাদিকল্প, (৩) ষষ্ঠ্যাদিকল্প, (৪) সপ্তম্যাদিকল্প, (৫) অষ্ট্যমাদিকল্প, (৬) মহাষ্টমীকল্প এবং (৭)

মহানবমীকল্প।

তবে সাতটি কল্পের মধ্যে নিজ ক্ষমতা, পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কল্প অনুযায়ী পূজা করা হয়। ষষ্ঠীর দিন বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস হয় শাস্ত্রানুযায়ী। সপ্তমীর দিন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নবপত্রিকা পূজা। নবপত্রিকা হলো কৃষিজ সম্পদের প্রতীক। এখানেই শাকম্ভরী দেবীর পূজা হয়। নবপত্রিকা আসলে ন'টি উদ্ভিদ বা চারার সমষ্টি। সেগুলি হলো, কলাগাছ, কালোকচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও সশিষ ধানগাছ। এগুলিকে শ্বেত অপরাজিতা লতা ও হলুদ সুতো দিয়ে বেঁধে নতুন শাড়ি পরিয়ে কলাবউ সাজানো হয়। কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণী, কচুর কালী, হলুদের দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধানের লক্ষ্মী। এগুলি প্রতিটি মা দুর্গার বিভিন্ন রূপ। নবপত্রিকার স্নানবিধি হলো, উষ্ণজলে কলা, সমুদ্রজলে ডালিম, সুগন্ধিজলে অশোক, রক্তজলে মানকচু, তিলতেলযুক্ত জলে ধান। এরকম প্রায় ৫০-৬০ প্রকার জল ও দ্রব্য প্রয়োজন হয়।

মহাষ্টমীতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং সন্ধিপূজার বিধি আছে। পুষ্পাঞ্জলির একটি মন্ত্র এরকম—

আন্ধ্যং কুষ্ঠং চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণম্।

বন্ধুস্বজন বৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্।। অর্থাৎ হে মা দুর্গা, আমার অন্ধত্ব, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, স্বজন বৈরাগ্য এবং দুর্গতি তুমি হরণ করো।

সন্ধিপূজায় লাগে ১০৮টি পদ্ম ও ১০৮টি প্রজ্বলিত দ্বীপ। পদ্ম ভক্তির প্রতীক আর জ্বলন্ত প্রদীপ জ্ঞানের প্রতীক যা অন্তরের অশুভ বৃত্তি বিনাশ করে। সন্ধিপূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে হয় এই পূজা।। তখন চামুণ্ডামায়ের স্তব করা হয়। ১০৮ শুভ সংখ্যা, কারণ একজন সুস্থ মানুষ সারাদিনে ২১৬০০ বার শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। একে ১০০ দিয়ে ভাগ করলে হয় ২১৬ । আর তাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে হয় ১০৮। ১০৮ বার করে দুর্গানাম জপ করতে করতে মেধস মুনি বৈশ্যক্রমে তা ১০০ গুণ বাড়িয়ে মোক্ষলাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের জন্য ১০৮ বার জপের জন্য ১০৮টি শুভ সংখ্যা।

মহানবমীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কুমারীপূজা। কারণ দেবী চণ্ডিকা কুমারী কন্যারূপে দেবতাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন।। তাই কুমারীপূজায় অল্পবয়স্কা কুমারীকন্যাকে মা দুর্গার সঙ্গে পূজা করা হয়। বিভিন্ন বয়সের কুমারীর শাস্ত্রমতে বিভিন্ন নাম রয়েছে। এইভাবে দুর্গাপূজায় কুমারীদের মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করা হয়। এপ্রসঙ্গে নবমীপূজার একটি মন্ত্র উল্লেখযোগ্য।

'মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি।

যদর্চিতং ময়া দেবী পরিপূর্ণং তদস্তু মে।।' অর্থাৎ হে মা দুর্গা, আমার মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন অর্চনাকে তুমি পরিপূর্ণ

করো।

দশমীর দিন প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করা, দর্পণে বিসর্জন, ঘট বিসর্জনের সঙ্গে বেলপাতা বা কলাপাতায় সিঁদুর দিয়ে 'শ্রীশ্রী দুর্গামাতা সহায়' লিখে মায়ের পায়ে অর্পণ এক আলাদা অনুভূতি। তবে এই নিয়মের ভিন্নতাও আছে। যাত্রামঙ্গল, মায়ের বরণের পর সিঁদুরখেলা, কনকাঞ্জলি আর বিসর্জনের ঠিক আগে একটি নীলকণ্ঠপাখি উড়িয়ে দেওয়া এবং বিসর্জনের পরে আর একটি উড়িয়ে দিয়ে কৈলাসে বার্তা দেওয়া প্রতীকীভাবে। পরম্পরাগতভাবে এই নিয়মগুলি আমাদের অগোচরেই ঘটে যায়, কারণ আমরা শুধু আনন্দ ও উৎসবে মেতে থাকি। প্রতিটি অর্পণের ও পূজার পদ্ধতিতে যে ভক্তি ও ঐতিহ্য থাকে তা উপলব্ধি করতে পারলে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যাবে।

দশমীর বিসর্জনের নিরানন্দের মধ্যে সকলের শান্তির জন্য শান্তিজল গ্রহণ এবং পরস্পর স্নেহ বিনিময়ে এক আত্মীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এককথায় দুর্গাপূজার মধ্যে রয়েছে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। শুধু আমাদের অনুসন্ধিৎসা দিয়ে তা উপলব্ধি করে মূল উদ্দেশ্য বুঝে পরম্পরার উদ্‌যাপন প্রয়োজন। □

চিল্কিগড়ের কনক দুর্গা

তুফান মাহাত

নিশাবলির রক্তেই সন্তুষ্ট মা কনকদুর্গা। রাজবংশের রাজবৈভব কালের নিয়মে অস্তমিত হওয়ায় শুধুই গল্পকথার ভেতরে মা কনকদুর্গা এখনও চিল্কিগড়ে রাজপরিবারের রূপকথা হয়ে জাগ্রত হয়ে রয়েছেন মায়ের আবাস ভূমিতে। সেই প্রাচীনকালে লোকধরা প্রহরীরা নরবলির জোগাড় করে নররক্তে দেবীকে সন্তুষ্ট করতেন। এখন সেই লোকধরা প্রহরীরা আর নেই। তাই দেবীকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় নিশাবলির রক্তে।

উপকথা অনুযায়ী, মেদিনীপুরের জামবনি পরগনার রাজা গোপীনাথ সিংহ মত্তগজ মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। সেই স্বপ্নকাহিনির আনুমানিক সময় ১১৫৬ বঙ্গাব্দ। রাজা গোপীনাথ সিংহ মত্তগজ স্বপ্নে দেখলেন দেবীকে। দেবীর এক হাতে খড়্গ, এক হাতে অশ্বের লাগাম, অন্যহাতে বরাভয়। সেই রাত্রেই রাজা রানির হাতের কঙ্কন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়েন। নাম হয় দেবী কনকদুর্গা। রাজবংশের বৈভবের দিন দেবীর পূজায় নরবলির অয়োজন করা হতো। বর্তমানে নরবলির জায়গায় চালু হয়েছে নিশাবলি। বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা প্রদেশের মানুষের কাছে দেবী কনকদুর্গা বড়োই জাগ্রত দেবী। দুর্গা পূজার এই কটাদিন কনকদুর্গা মন্দিরে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। ডুলুং নদীর পাড়ে দেবী কনকদুর্গার মন্দির অবস্থিত। বর্তমানে যে জায়গায় দেবীর মন্দির রয়েছে অতীতে দেবীর এই বাসস্থানের নাম ছিল তিহার গড় বা তিহার দ্বীপ। নবমীর দিন কনকদুর্গা মন্দিরে মহিষ বলি হয়। নবমীর দিন মন্দিরে সব থেকে বেশি মানুষের সমাগম হয়। কথিত, আগে দেবীর পূজার জন্য নিখুঁত মানুষ ধরে নিয়ে আসা হতো। কোনো এক সময় রাজার লোকধরা প্রহরীরা এক ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে আসেন। যূপকাষ্ঠে সেই ব্রাহ্মণ দুর্গাস্তোত্র জপ করতে থাকলে মন্দিরের পূজারি রামচন্দ্র ষড়ঙ্গী শিউরে ওঠেন। খবর পেয়ে রানি গোবিন্দমণি এসে সেই ব্রাহ্মণকে যূপকাষ্ঠ থেকে মুক্ত করে দেন। সেই থেকেই দেবী কনকদুর্গার পূজায় নরবলি বন্ধ হয়ে যায়। নরবলির পরিবর্তে চালু হয় নিশাবলি। সেই নিশাবলির প্রথা আজও চালু রয়েছে।

অষ্টমীর দিন রাত্রে একটি পাঁঠাকে নিয়ে যাওয়া হয় দেবী মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পাতাল কুয়োর সামনে। সেখানে একজন পাঁঠার মুখ বন্ধ করেন আর একজন পাঁঠার পা টেনে ধরেন, অন্যজন খড়্গের এক কোপে পাঁঠাটিকে বলি দেন। পাঁঠাবলির সেই রক্ত পাতাল কুয়োর চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বলির নামই নিশাবলি। কথিত, রানি গোবিন্দমণি বিরাম ভোগের প্রবর্তক করেন। মহানবমীর আগের দিন নিশাবলির মাংস একটি মাটির হাঁড়িতে রেখে সেদ্ধ করা হয়। পরে সেই মাংস ভোগ বিরামকক্ষে রেখে দেওয়া হয়। নবমীর দিন চণ্ডীহোমের পর আবার বলি দেওয়া হয়। তারপর বিরাম ভোগের হাঁড়ি খুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে চিল্কিগড়ে যে স্থানে দেবী কনকদুর্গার মন্দিরটি রয়েছে সেই জায়গাটির নাম 'গড় লাটা'। এখানে নানা ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। ডুলুং নদীর তীরে কনকদুর্গার মন্দির পর্যটকদের কাছে খুবই প্রিয় জায়গা।

রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্য জানিয়েছেন, পূজা শেষে দেবীর ঘট ডুলুং নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর দেবীমূর্তি কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। □

বাগবাজার হালদার বাড়ির দুর্গোৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

কলকাতার প্রাচীন পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলো সর্বজনীন পুজোর জাঁকজমকের আধিক্যে ক্রমশ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাচ্ছে। শহরের দুর্গাপূজা বললেই চোখের সামনে ভাসে সর্বজনীন পূজার আড়ম্বর। যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ায় তাদের দীনতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে পূজার মধ্যে। তবে এখনও কিছু বনেদি পরিবার তাদের প্রাচীন প্রথা ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে প্রতি বছর দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। বাগবাজার হালদার বাড়ির দুর্গাপূজা কলকাতার একটি অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত পারিবারিক দুর্গোৎসব। বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠের ঠিক উলটো দিকে হালদার বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল ১৮৮০ সালে। কিন্তু তথ্য অনুযায়ী এদের পূজার বয়স চারশো বছরেরও বেশি। আদিতে ওড়িশা, তারপর হুগলি জেলার চন্দননগর, সেখান থেকে কলকাতার বউবাজার এবং পরবর্তীকালে বাগবাজারে দুর্গাপূজার পরম্পরাকে বহন করে চলেছেন হালদার পরিবার।

ওড়িশার সাহেবপুরে হালদার পরিবারের এক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন, একজন জেলের ঘরে মাটির আট হাত নীচে আছে কষ্টিপাথরের দুর্গামূর্তি। মূর্তিকে উদ্ধার করে পূজা করারও নির্দেশ পান তিনি। সেই থেকে হালদার পরিবারের দুর্গাপূজার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে ব্যবসার প্রয়োজনে এঁরা ওড়িশা থেকে চলে আসেন চন্দননগরে। শুরু করেন তামাকের ব্যবসা। এই ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি হওয়ায় এরা যখন কলকাতার বউবাজারে চলে আসেন, তখন কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। হালদার বংশের উত্তরপুরুষ রাখালদাস হালদার সপরিবারে বউবাজারের বাড়ি ছেড়ে বাগবাজারে চলে আসেন ১৮৮০ সালে। এই বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় রানি রাসমণি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত আমন্ত্রিত হতেন। নারীশিক্ষা প্রসারে ভগিনী নিবেদিতার আগমন ঘটেছিল হালদার বাড়িতে।

রথের দিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয় পূজার। কষ্টিপাথরে খোদাই করা সুন্দর দেবীমূর্তি উচ্চতায় দুই থেকে আড়াই ফুট। কাঠের সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিত্যপূজা পান। মা এখানে সন্তান পরিবৃতা দশভুজা নন। দ্বিভুজা মা জয়া বিজয়া দুই সহচরীর সঙ্গে অধিষ্ঠিতা। সপ্তমীর সকালে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করে নবপত্রিকা স্নান করানো বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহাষ্টমীর দিন প্রায় পাঁচশো লোক সমাগম হয় হালদার বাড়িতে। পূজা হয় বৈষ্ণবমতে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে পর্যন্ত পাঁঠাবলি দেওয়ার প্রথা থাকলেও একবার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, বলি এখন হয় না। তবে পূজার সময় সেই খাঁড়া প্রতিমার সামনে রাখা থাকে। প্রতিবছর পুরোহিত আসেন মেদিনীপুর থেকে। এই নিয়মও বহু পূর্বের। হালদার বাড়ির প্রতিমা অত্যন্ত জাগ্রত বলে সুনাম আছে। অনেকেরই মানত করে মনস্কামনা পূরণ হয়েছে।

প্রতিবছরই কিছু না কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে হালদার বাড়ির পূজাকে কেন্দ্র করে। কয়েক বছর আগে ঘটা এরকমই অলৌকিক ঘটনার কথা জানা গেল বর্তমান বংশধর দেবাশিস হালদারের কাছ থেকে। সপ্তমীর সকালে কলাবউ স্নান করাতে গিয়ে ঢাকির ছোটো একটি ছেলে হারিয়ে যায়। অনেক খুঁজেও যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ। উৎসবের আনন্দে ছন্দপতন ঘটে এরকম একটি মর্মান্তিক ঘটনায়। ঢাকি বাপের বুক ফাঁকা করে যে ছেলে চলে যায়, সে কী আর সত্যি ফিরবে না? মায়ের পূজা চলাকালীন এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটবে, তা সকলেরই অকল্পনীয়। সপ্তমী অতিবাহিত হয়ে পরদিন সন্ধিপূজা সমাগত। নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেই ঢাকি ঢাক তুলে নেয়। সন্ধিপূজার মাঝখানে ঢাক বাজাতে বাজাতে সে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারপরেই হঠাৎ সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। মুখে হর্ষধ্বনি, 'পেয়ে যাবো, পেয়ে যাবো। মা বলেছে পেয়ে যাব।' এরপর ঢাকের শব্দের সঙ্গে তাল রেখে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে ঢাকি। ঢাকের প্রাণমাতানো বাজনায় সেদিন আবার উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল হালদার বাড়ি। সেদিন বিশ্বাস্যভাবে নবমীর ভোরে এক অচেনা লোক হালদার বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে যায় ঢাকির হারানো ছেলেকে। আজও ঢাকিরা এই বাড়ির সম্মাননীয় অতিথি। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রবেশ করার সময় তাদের শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে প্রণাম করা হয়। বিসর্জনের দিন একই প্রথায় এদের সম্মান দক্ষিণা দিয়ে ও শাঁখ বাজিয়ে বিদায় দেওয়া হয়।

আগের মতো জাঁকজমকের আধিক্য না থাকলেও হালদার বাড়ির পূজা আজও নিষ্ঠা, ভক্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। □

দুই বঙ্গকে আজও মিলিয়ে দেয় সিউড়ির বসাক বাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা

তিলক সেনগুপ্ত

সিউড়ির বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা বলতেই উঠে আসে বসাক বাড়ির পূজা। আর বসাক বাড়ির পূজা মানেই দুই বঙ্গের মিলনক্ষেত্র। ওপার বঙ্গের বনেদি বাড়ির পূজার রীতি মেনে আজও সিউড়ির বসাক বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়। দুর্গার বোধন থেকে বিসর্জন সবই হয় ওপার বঙ্গের রীতি মেনে। তাই পঞ্চমী থেকেই পূজা শুরু হয়ে যায় সিউড়ির বসাক বাড়িতে।

সিউড়ির বসাক বাড়ির দুর্গাপূজা কমপক্ষে ৩০০ বছরের বেশি পুরাতন। এই পূজার শুরুটা হয়েছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ধামরাই গ্রামে। সেখানে বাড়ির প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দিরেই পূজা হতো। একেবারে পঞ্চমীর দিন থেকেই পূজা শুরু হয়ে যেত। দুর্গাপ্রতিমা ছিল মৃন্ময়ী। প্রতি বছর চতুর্থীতে মূর্তি চলে আসত। তারপর পাঁচদিন ধরে পূজার পর দশমীতে বিসর্জন হতো।

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধামরাই গ্রামের বসাক পরিবারের অবস্থান বদলেছে। দেশভাগের সময় ওপার বঙ্গে থেকে এপারে আসেন পরিবারের সকলে। বাংলা ১৩৬৬ সালে যামিনীকান্ত বসাক সিউড়িতে এই পূজার প্রচলন করেন। বর্তমানে সিউড়িতেই তাদের বসবাস। কিন্তু জায়গা বদল হলেও বসাক পরিবারের দুর্গাপূজায় ছেদ পড়েনি। বদলায়নি রীতিও। বসাক বাড়িতেই দুর্গা মন্দির তৈরি হয়েছে। আর সেটা হয়েছে হুবহু ধামরাই গ্রামের দুর্গা মন্দিরের আদলে। একই রকম বেদি এবং সামনে নাটমন্দির রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, বসাক পরিবার দেশ ত্যাগের সময় বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের পূজিত দেবী মনসার ঘট। সেই ঘটটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সিউড়িতে তৈরি দুর্গা মন্দিরে। এই পরিবারের পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে পঞ্চমীর দিন থেকেই পূজা শুরু হয়ে যায়। বাংলাদেশে যেমন দুর্গা পূজার আগে মা মনসার পূজা দিয়ে দুর্গাপূজা শুরু করা হতো। সেই একই রীতি এখানেও পালন করা হয়। দুর্গা পঞ্চমীতে আগে মা মনসার পূজা দেওয়া হয় এবং তারপর শুরু হয় দশভুজার আবাহন। কুলদেবী মনসা পূজা দিয়ে শুরু হয় দেবী দুর্গার আরাধনা। সপ্তমী তিথিতে দেবীর আবাহন করার পর মহাঅষ্টমী তিথিতে কুমারী পূজা হয়। দেবী এখানে পরম বৈষ্ণবী রূপে পূজিতা হন। তাই কোনো বলিদান প্রথা নেই। মহানবমীর দিন যজ্ঞ। দরিদ্র নারায়ণ সেবা। দশমীতে সন্ধ্যায় দেবী বিসর্জনে থাকে সমানতার পরশ। মন্দিরের বেদী থেকে দেবী মূর্তি জনজাতি ভাইদের ঘাড়ে করেই নামানোর প্রথা। তাদের হাতেই দেবী বিসর্জন হয়ে আসছে এই বাড়িতে।

বসাক বাড়ির গৃহবধূ মৌমিতা বসাক জানিয়েছেন, 'আমাদের এই পূজা বৈষ্ণব মতে হয়ে থাকে। যে কারণে মহাপঞ্চমীর দিন থেকে যখন পূজা শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই আর কোনো আমিষ খাবার বাড়িতে ঢোকে না। বিজয়া দশমীর পর আগে মৃন্ময়ী মূর্তি বিসর্জন করার যে রীতি ছিল তা এখন আর নেই। কারণ মা এখন ধাতুর প্রতিমাতে পরিণত হয়েছে এবং সারা বছরই তিনি এখানে থাকেন।'

পূজার রীতি একই থাকলেও বদল হয়েছে কেবল মূর্তির। আগে মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমার পূজা হতো। কিন্তু সেই মূর্তি বিসর্জন করার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন হয়, বর্তমানে তার অভাব দেখা দেয়। তাই এখন ধাতুর মূর্তিতে পূজিতা হন বসাক পরিবারের দেবী দুর্গা। এই মূর্তির বিসর্জন হয় না। সিউড়ির বসাক বাড়িতে সারা বছরই থাকে এই ধাতব দুর্গামূর্তি।

একটা সময় যখন বাংলাদেশে বসাক বাড়ির এই দুর্গাপূজা হতো সেখানে যাত্রা, নাটক-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে সকল আজ এখন অতীত। তবে বসাক পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সেই রীতি বজায় রেখে পরিবারের সদস্যরাই নাট মন্দিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজেদের মধ্যে গানের আসর বসান। □

ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুর চণ্ডীমন্দিরে দুর্গাপূজা

দীপক চট্টোপাধ্যায়

মালদা জেলার চাঁচল রাজ পরিবারের অন্যতম অবদান চাঁচল সংলগ্ন পাহাড়পুর গ্রামে এক সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ, যা বর্তমানে চণ্ডী মণ্ডপ নামেই সুপরিচিত। প্রায় দুশো বছর আগে নির্মিত এই মন্দির। তিনটি চূড়া, উত্তর দক্ষিণে গম্বুজাকৃতি দুটি ঘর এবং বিশাল লম্বা বারান্দা নিয়ে এই মন্দির। শোনা যায়, রাজপরিবারের এক রাজা স্বপ্নাদেশে পাহাড়পুরের নিকটবর্তী সতীঘাট নামক স্থান থেকে একটি অষ্টধাতুর মা চণ্ডীর বিগ্রহ দেখতে পেয়ে তা এই মন্দিরে স্থাপন করেন। পরে তা চাঁচল রাজ ঠাকুরবাড়িতে স্থাপিত হয়। প্রতি বছর দুর্গা পূজার সপ্তমীর দিন মহাসমারোহে ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়ে রুপো নির্মিত ছত্রছায়ায় হাজার হাজার মানুষ শোভাযাত্রা করে এই বিগ্রহকে পাহাড়পুর চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে আসেন।

এখানে মাটির তৈরি মা চণ্ডীর পূজা এই বিগ্রহের সান্নিধ্যেই হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। দশমীর দিন এই বিগ্রহকে শোভাযাত্রা সহকারে চাঁচল ঠাকুর বাড়িতে রেখে আসা হয়। এই পূজা বর্তমানে চাঁচল এস্টেট ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত। মালতীপুর কালীবাড়ি এবং চাঁচল রাজ ঠাকুর বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ এই ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে চলে। তবে যে অর্থ দেওয়া হয় তাতে পুরোহিত ও ভোগের খরচ চালানো খুব দুষ্কর। এখানকার পূজা নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে আসছে। শোনা যায়, মন্দির বেদী পঞ্চমুণ্ডের উপর নির্মিত। মহাষ্টমীর দিন এখানে ভক্তের ঢল নামে। হাজার হাজার মানুষ উপোস থেকে ভোগের ডালা নিয়ে মাকে অঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা এবং মঙ্গল কামনা করেন। অনেকে আবার মানত করেন মা চণ্ডীর কাছে। এখানে কুমারী পূজা রাজ আমল থেকেই নিষ্ঠা সহকারে হয়ে আসছে। এলাকার প্রবাসী যুবকদের আর্থিক সহযোগিতায় ভাণ্ডারা চলে। হাজার হাজার ভক্তকে লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

এই চণ্ডী মন্দিরে একসময় প্রচুর পাঁঠা ও মহিষ বলি হতো প্রসাদরূপে মন্দিরের সামনের দিঘীর জল রক্তে লাল হয়ে যেত বলে শোনা যায়। তবে পশু বলি এখন বন্ধ হয়ে আখ ও চালকুমড়া বলি দিয়ে

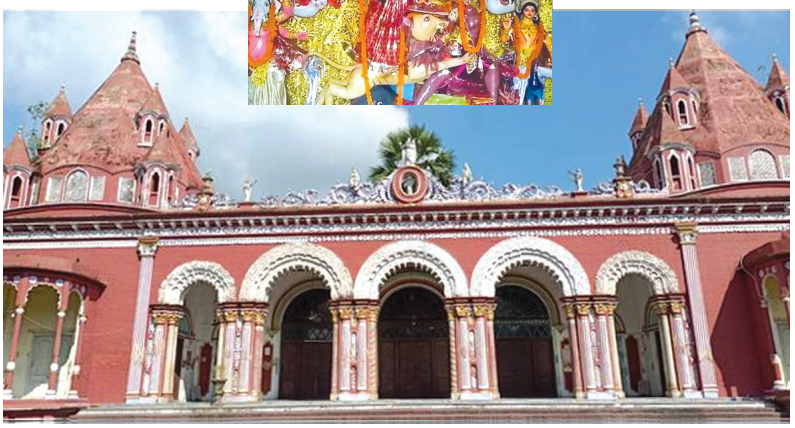

নিয়ম রক্ষা করা হয়। দশমীর দিন মায়ের বিসর্জন হয় গোধূলি বেলায়। সূর্যাস্তের আগেই। সধবাদের সিঁদুর খেলার পর মায়ের বিসর্জন পর্ব শুরু হয়ে যায়। বিসর্জনের মূল দায়িত্বে থাকে হিন্দু সমাজের পিছিয়ে পড়া কুড়োল অর্থাৎ কাঠুরিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের কাঁধে চেপেই মা চণ্ডী জনসমুদ্রের মাঝে ধীরে ধীরে বিসর্জনের ঘাটে এগিয়ে যান। যে ঘাটে স্বপ্নাদেশে মায়ের বিগ্রহ মিলেছিল সেখানেই বিসর্জন করা হয়। পূজায় সামাজিক সমরসতার এক বাস্তব উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়।

চাঁচলের শেষ রাজা ছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রায় পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে তিনি এলাকার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বহু বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ছাত্রাবাস, মন্দির, রাস্তাঘাট-সহ প্রভূত উন্নতি সাধন করেন চাঁচল এলাকার। আর একটা কথা যেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহলো, এখনো সতীঘাটের মরা নদীর ওপার থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরা মা চণ্ডীকে আলো দেখান বিসর্জনের সময়। বহুদিন থেকে এই প্রথা চলে আসছে। কথিত, নদীর ওপারের সাউড়গাছি, বিদ্যানন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে একবার কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। সে সময় এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরা মা চণ্ডীর কাছে এই মহামারীর কবল থেকে রক্ষা পেতে কাতর প্রার্থনা করেন। এরপর থেকে ওই সমস্ত গ্রামে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সেই থেকেই মায়ের বিসর্জনের সময় নদীর ওপার থেকে শ্রদ্ধা জানাতে হাতে লণ্ঠন, কুপি, মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। এখন মোবাইলের টর্চ জ্বালাতেও দেখা যাচ্ছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে চাঁচল ও পাহাড়পুরের মাটিতে। তাঁর বহু রচনায় চাঁচল রাজবাড়ি, চণ্ডী মণ্ডপের উল্লেখ আছে। □

বনোয়ারী বাবু

স্থান— উত্তর বিহারের একটি ছোট শহর। কাল— প্রায় সত্তর বৎসর আগে। বেলা তিনটে, আমাদের মিড্‌িল ইংলিশ অর্থাৎ মাইনর স্কুলের থার্ড ক্লাসের পাটীগণিত পড়ানো হচ্ছে। ক্লাসের ছেলেরা উসখুস ফিসফিস করছে দেখে বিধু মাস্টার বললেন, কী হয়েছে রে?

তখন শিক্ষককে স্যার বলার রীতি ছিল না, মাস্টারমশাই বলা হতো। আমাদের মুখপাত্র কেষ্ট বলল, এইবার ছুটি দিন মাস্টারমশাই, সবাই চাদরাবাগে যাব।

—সেখানে কীজন্যে যাবি?

—কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেছেন, তার দাড়ি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। তাই আমরা দেখতে যাব। হেঁই মাস্টারমশাই ছুটি দিন।

—চারটের সময় ছুটি হলে তারপরে তো যেতে পারিস।

— অনেক দূরে যেতে হবে, বেলা হয়ে যাবে। শুনেছি রোজ বিকেলে তিনি রায়সাহেবদের বাড়ি দাবা খেলতে যান। দেরি করে গেলে দেখা হবে না।

বিধু মাস্টার বললেন, বেশ, সাড়ে তিনটেয় ছুটি দেব। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। দাড়িবাবুর কথা শুনেছি বটে।

চাদরাবাগ অনেক দূরে, আমরা প্রায় সাড়ে চারটের সময় বিভূতিবাবুর বাড়ি পৌঁছুলাম, দাড়িবাবু সেখানেই উঠেছেন। বারান্দায় একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে তিনি হুঁকো টানছিলেন। আমাদের দলটিকে দেখে তাঁর বোধহয় একটু আমোদ হলো, নিবিড় কালো দাড়ি-গোঁফের তিমির ভেদ করে সাদা দাঁতে একটু হাসির ঝিলিক ফুটল। সেকালে ব্রাহ্মরা প্রায় সকলেই দাড়ি রাখতেন, অব্রাহ্মদেরও অনেকের বড়ো বড়ো দাড়ি ছিল। কিন্তু সেসব দাড়ি এই নবাগত ভদ্রলোকের দাড়ির কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

বিধু মাস্টার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, এই ছেলেরা আপনাকে দেখতে এসেছে মশাই, কিছুতেই ছাড়বে না, তাই আধ ঘণ্টা আগেই ক্লাস বন্ধ করতে হলো।

দাড়িধারী ভদ্রলোকের নাম বনোয়ারী বাবু। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন, বেশ, দেখবে বই কী, দেখাবার জন্যেই তো রেখেছি। যত ইচ্ছে দেখ বাবারা, পয়সা দিতে হবে না।

দাড়িটি বনোয়ারী বাবুর গলায় কম্ফর্টরের মতন জড়ানো ছিল, এখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আলুলায়িত করলেন। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলে পড়ল। সবিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা একযোগে বলে উঠলুম, উরে বাবা!

বনোয়ারী বাবু বললেন, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? টেনে দেখতে পার, আমার দাড়ি যাত্রাদলের মুনি-ঋষিদের মতন টেরিটিবাজারের নকল দাড়ি নয়। এই বলে তিনি দাড়ি ধরে বারকতক হেঁচকা টান দিলেন।

বিধু মাস্টার বললেন, আচ্ছা বনোয়ারী বাবু, আপনার দাড়ির বর্তমান ঝুল কত? সাড় তিন ফুট হবে কি?

থুতনি থেকে পাক্কা বিশ গিরে, মানে পৌনে চারফুট। পরশু আবদুল দরজি ফিতে দিয়ে মেপেছিল, তার ইচ্ছে একটা মলমলের খোল করে

দেয়, যাতে দাড়িতে গরদা না লাগে। আমি তাতে রাজি হইনি।

—এতখানি গজাতে ক'বছর লেগেছে?

—তা প্রায় দশ বছর। চব্বিশ বছর বয়সে কামানো বন্ধ করেছিলুম, এখন বয়স হলো চৌত্রিশ।

বিধু মাস্টার তাঁর ক্লাসের উপযুক্ত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, এই ছেলেরা, চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সে দাড়ি যদি পৌনে চার ফুট হয়, তবে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে কত হবে?

ছেলেদের ঠোঁট নড়তে লাগল, বিড়বিড় করে মানসাঙ্ক কষছে। অঙ্কে আমার খুব মাথা ছিল, সকলের আগেই বললুম, সাড় সাত ফুট মাস্টারমশাই।

বিধু মাস্টার বললেন, কারেক্ট। আচ্ছা বনোযারী বাবু, দশ বছর পরে সাড়ে সাত ফুট দাড়ি হলে আপনি সামলাবেন কী করে?

বনোয়ারী বাবু সহাস্যে বললেন, তা তো ভাবিনি, তখন যা হয় করা যাবে, না হয় কিছু ছেঁটে ফেলব।

আমাদের দলের সবচেয়ে সপ্রতিভ ছেলে কেষ্ট। সে বলল, না না ছাঁটবেন না, কানের পাশ দিয়ে তুলে মাথায় পাগড়ির মতন জড়ালে বেশ হবে। বনোয়ারী বাবু বললেন, ঠিক বলেছ হে ছোকরা, পাগড়িই বাঁধব, পশমি সালের চাইতে গরম হবে। একটু আমতা আমতা করে বিধু মাস্টার বললেন, কিছু মনে করবেন না বনোয়ারী বাবু, ইয়ে, একটা প্রশ্ন করছি। আপনি কি বিবাহিত?

—অভ কোর্স। হোআই নট?

— তাহলে তাহলে—

—আমার স্ত্রী এই দাড়ি বরদাস্ত করে কী করে— এই তো আপনার প্রবলেম? চিন্তার কারণ নেই মাস্টার মশাই। তিনি প্রসন্ন মনেই মেনে নিয়েছেন, মিউচুয়াল টলারেশান, বুঝলেন কি না। তাঁরও তো ফুট তিনেক আছে।

বিধু মাস্টার আঁতকে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ!

— তাঁরটা দাড়ি নয় মশাই, মাথার চুল, যাকে বলে কেশপাশ, কুন্তলভার, চিকুরদাম।

আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। তারপর বনোয়ারী বাবু বাঙ্গালি ময়রার দোকান থেকে জিলিপি আনিয়ে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। আমরা খুশি হয়ে বিদায় নিলুম।

(পরশুরাম গল্প সমগ্র থেকে)

বীর বনবাসী

তেলংগা খড়িয়া

জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী তেলংগা খড়িয়ার জন্ম ১৮০৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গুমলা জেলার মুরগু গ্রামে। তিনি মুরগু গ্রামের খড়িয়া জমিদার এবং পাহান পরিবারের সদস্য ছিলেন। ছোটনাগপুর ক্ষেত্রে জনজাতিদের পারম্পরিক স্বায়ত্তশাসন ছিল। বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন। ১৮৫০ সালে ছোটনাগপুরে ব্রিটিশ শাসন চালু হলে তাঁদের সেই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাদের কর প্রদানে বাধ্য করা হয়। এর ফলে মানুষের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তেলংগা খড়িয়া এই অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। জনজাতি যুবকদের সংগঠিত করে গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করে ইংরেজদের ব্যাংক ও কোষাগার লুঠ করতে লাগলেন। দশ বছর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ জারি রাখেন। এক সময় এক গ্রামে পঞ্চায়েত সভায় ব্যস্ত থাকার সময় ইংরেজ সৈন্য গ্রাম ঘিরে ফেলে তাঁকে বন্দি করে। ১৮ বছর পর মুক্ত হয়ে তিনি আবার ইংরেজদের আক্রমণ করতে থাকলেন। একদিন প্রার্থনা করার সময় ইংরেজ পুলিশ লুকিয়ে তাঁকে গুলি করলে তাঁর মৃত্যু হয়।

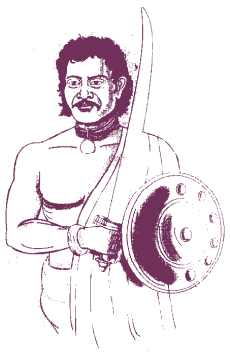

জানো কি?

- ভারতে প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় মুম্বাইয়ে ১৯১৬ সালে।
- 'ভারত ভারতীয়দের জন্য' বলেছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী।
- মানবদেহে কিডনি দ্বারা রক্ত থেকে ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড ফিল্টার হয়ে থাকে।
- ভারতের সর্বোচ্চ সড়ক পথ হলো লেহ্-মানালি হাইওয়ে। ১৭ হাজার ফুট উচ্চতায়।
- ওজোন স্তরকে পরিবেশের প্রতিরক্ষমূলক ঢাল বলা হয়।
- অ্যামেনিয়া গ্যাসের কারণে ফ্রিজের জল ঠাণ্ডা থাকে।

ভালো কথা

পিঁপড়ের বুদ্ধি

কদিন আগে তিনদিন ধরে বৃষ্টি। চারদিক ভেসে গিয়েছে। জলে থইথই। ধানজমি সব নদীর মতন লাগছিল। রাস্তার উপর দিয়েও জল বইছিল। হঠাৎ দেখি মৌচাকের মতো কী একটা ভেসে আসছে। কাছে আসতেই দেখি, ওটা একটা পিঁপড়ের দলা। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে এ ওর পা কামড়ে ধরে আছে। আমি দেখার জন্য ওটার পিছে পিছে যাচ্ছিলাম। বাঁশঝাড়ের কাছে রাস্তাটা বাঁক ঘুরতেই পিঁপড়ের দলাটা বাঁশঝাড়ে আটকে গেল। দেখি, পিঁপড়েগুলো ধীরে ধীরে বাঁশ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। তারপর দেখি, ওদের মধ্যিখানে হাজার হাজার ডিম। ওরা সবাই একটা করে ডিম মুখে নিয়ে উঠতে লাগল। দশ মিনিটের সধ্যে ওরা বাঁশ ঝাড়ের মাথায় উঠে গেল।

সুমনা দাস, নবম শ্রেণী, ডিটলহাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) র স ন্ত ফু	(১) ন ন ম ব লি স
(২) হা বাঁ ধ রা	(২) ট শো কু ভি মু ত

১৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) ছলাকলা (২) দূরভাষ

১৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) হিসাবরক্ষক (২) সমভাবাপন্ন

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) অদ্রিজা দে, কান্দি, মুর্শিদাবাদ (৩) স্নেহা দত্ত, বউবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া (৪) পারুল মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

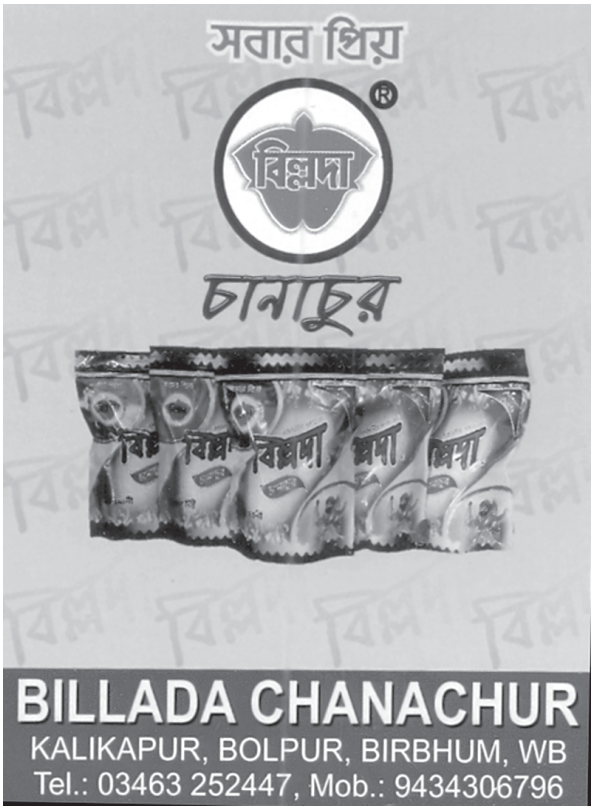

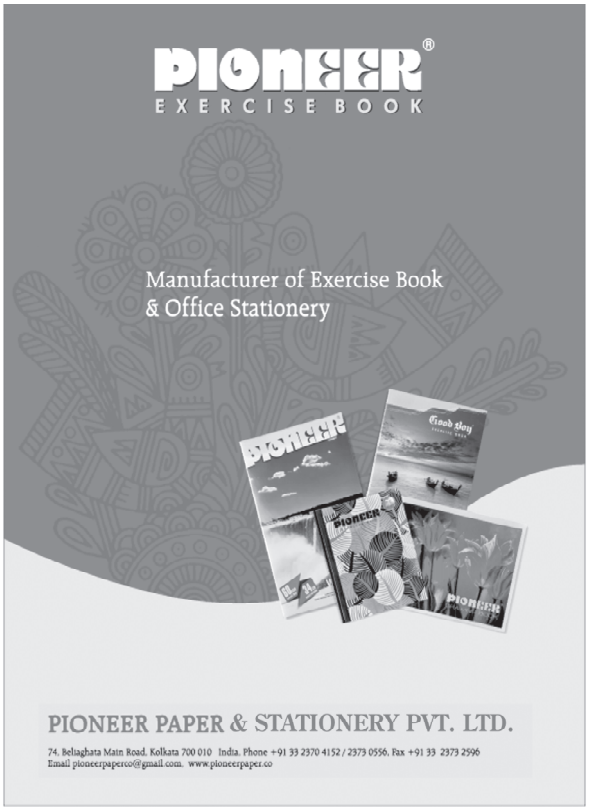

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কামারকিতা গ্রামের চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজায় আনন্দে মেতে ওঠে গ্রামবাসী

ড. দেবনাথ মল্লিক

পূর্ব-বর্ধমান জেলার কামারকিতা গ্রামের চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা নিয়ে বলার আগে কামারকিতা গ্রাম সম্পর্কে একটু অবহিত হওয়ার প্রয়োজন।

পূর্ব-বর্ধমান জেলার বর্ধমান সদর মহকুমার অন্তর্গত কামারকিতা গ্রামটি প্রকৃত অর্থেই একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম কিন্তু এর ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সর্বসাধারণ বিশেষত ইতিহাস প্রেমীদের আকর্ষণ করে। সারা গ্রামময় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র পুরাকীর্তি। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, প্রাচীনকালে এই গ্রামটি এক সুসমৃদ্ধ জনপদের অঞ্চল বিশেষ ছিল এবং এই অঞ্চলে প্রথম বসতিকালে কামারগণের সংখ্যাধিক্যের কারণেই গ্রামটির এরূপ নাম। প্রায় দেড়শো বছর আগে গ্রামটি কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ছিল। বর্ধমান শহর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে গ্রামটির অবস্থান। কোনো কারণে এই সমৃদ্ধ জনপদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বর্তমান পল্লীর পত্তনও অন্তত ছ'শো বছর আগে হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান।

দামোদর নদ এবং বাঁকানদীর মধ্যবর্তী স্থানে (অধুনা বর্ধমান শহর) তদানীন্তন বর্ধমান মহারাজার উচ্চপদস্থ এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী রাজারাম পালের পৈতৃক নিবাস। বর্ধমান রাজের নিকট অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সততার পুরস্কারস্বরূপ উচ্চস্থান এবং সেই সঙ্গে কামারকিতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভূত সম্পত্তি জায়গির স্বরূপ প্রাপ্ত হন তিনি। সময়কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক নাগাদ হবে বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। রাজারামের পুত্র দক্ষিণেশ্বরও বর্ধমান রাজের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় পতিত হয়ে তিনি বর্ধমান শহরের ভিটেমাটি চিরতরে পরিত্যাগ করে কামারকিতা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। রাজারাম পালের চতুর্থ পুরুষ গোকুল চন্দ্র পাল সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে কামারকিতা গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি শুধু কামারকিতা নয়, ওই অঞ্চলে সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও মনোরম উদ্যান (শ্যামবাগান) সমন্বিত এই দেবালয়টি পর্যটক ও ভক্তদের কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এবং এরও সেবাইত ওই 'চৌধুরী পরিবার'ই। প্রায় পাঁচ-ছয় কাঠা জায়গার উপর 'দুর্গাবাংলা'। চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত।

মূল মন্দির বর্তমানে টালিনির্মিত। দুই দিকে সংলগ্ন দুটি কক্ষ— 'বোধন ঘর' ও 'ভাণ্ডার ঘর'। মন্দিরটি দক্ষিণাভিমুখী, পশ্চিমদিকে দুটি অতিথি কক্ষ। বর্তমানে এগুলিতে এম.আর.সপ এবং পোস্টঅফিস রয়েছে। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় 'ষষ্ঠীকল্পাদি' দিয়ে দেবীর বোধনের শুভারম্ভ। যদিও রথযাত্রায় প্রতিমার কাঠামোয় মৃত্তিকা অর্পণের মধ্য দিয়েই এর শুভ সূচনা। দুর্গাপূজার দিনগুলিতে ওই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী সব গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আনন্দে মেতে ওঠেন এই পূজাকে কেন্দ্র করে। শোনা যায়, শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব (গন্ধবাবা) এই গ্রামে শ্রীশ্রীদুর্গামাতা ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ-কে প্রণাম করতে আসতেন। শোনা যায় এখানে দুর্গাপূজার প্রথম দিকে প্রচুর পশুবলি হতো। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়, বর্তমানে চালকুমড়ো, আখ ইত্যাদি বলিদানে ব্যবহৃত হয়। এই পূজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান— 'গোরুছোটানো'। বিজয়া দশমীর অপরাহ্নে সমস্ত গ্রামবাসী নতুন পোশাকে হাজির হন গ্রামেরই উত্তরপূর্বে অবস্থিত 'নতুন পুকুরের' পাড়ে। সব গোশালার গোরুগুলি সুসজ্জিত করে গোবালকরা শুরু করে দৌড়। যেন দশমীর সন্ধ্যায় মাকে কৈলাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাহনকে পাঠিয়েছেন শিব। অশ্রুসজল চোখে মাকে বিদায় জানানোর আগে সমস্ত গ্রামবাসী মেতে ওঠেন এই অপূর্ব অনুষ্ঠানে। যদিও কালের স্রোতে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে এই ধরনের অনুষ্ঠান। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি পল্লীজননীর প্রসারিত কোমল অঙ্কে সমুদ্রুত ও পরিপুষ্ট। □

জলপাইগুড়ি শহরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা

নাড়ুগোপাল দে

'শিবের সনে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আশ্বিন মাসে বাপের বাড়ি আসেন ভগবতী'। যদিও এই পূজায় ভগবতীর চার সন্তান এবং স্বামী মহাদেবের সঙ্গে মর্ত্যে আসেন ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দুই সখী জয়া, বিজয়া ও দেবী মহামায়া। কথা বলছি জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির কয়েক শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজার।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রাজা শিশু সিংহের আমলেই এই দুর্গাপূজার প্রচলন। যার বয়স এখন প্রায় ৫১৪ বছরের কাছাকাছি। তবে সেই রাজ আমল আর নেই। পরিবারের অনেক সদস্যই কাজের সূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকেন। তাই আগের মতো আড়ম্বর হয়তো নেই, কিন্তু ভক্তি আর ঐতিহ্যে এতটুকুও ভাঁটা পড়েনি আজও।

আশ্বিনে নয়, এখানে মায়ের আরাধনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় জন্মাষ্টমীর পরের দিন কাঠামো পূজার মাধ্যমে। এদিনের নন্দোৎসবেই সূচনা ঘটে আসন্ন শারদীয়া দুর্গাপূজার। এই উৎসব মূলত কাদা খেলা। তবে সেই খেলাও নিছক কাদায় লুটোপুটি খাওয়া নয়। এই মাটি দিয়েই গড়া হয় দেবী প্রতিমা। দেবী এখানে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা। তাঁকে সাজানো হয় বেনারসি শাড়িতে। গলায় থাকে সোনা ও নবরত্নের হার। এখানে দেবী একই সঙ্গে ব্যাঘ্র ও সিংহবাহিনী। সিংহের একজোড়া ডানাও রয়েছে।

কালিকা পুরাণ মতে এখানে সম্পন্ন হয় মায়ের আরাধনা। মহালয়াতে পরিবারের সকলের উপস্থিতিতে তর্পণ ও চক্ষুদান পর্ব সম্পন্ন হয়। সেদিনই আয়োজন করা হয় কালীপূজার। মহাসপ্তমীতে সম্পন্ন হয়। 'অর্ধরাত্রি পূজা'। সেখানে বাইরের দর্শনার্থীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। এক সময় নরবলির প্রচলন ছিল। বর্তমানে সেসব আর নেই। পরিবর্তে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পুতুলই বলি দেওয়া হয়। অষ্টমীতে কুমারী পূজার আকর্ষণে দর্শনার্থীর ভিড়ে উপচে পড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ। তবে দেবীকে পূজার প্রতিদিনই দেওয়া হয় আমিষ ভোগ। খামতি রাখা হয় না মায়ের যত্ন-আত্তিতে। কিন্তু অবশেষে বিষাদের সুর। ঢাকের কাঠিতে বেজে ওঠে বিসর্জনের বাজনা।

প্রতিমা নিরঞ্জনের রীতিমতো আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রার। মা যেন বুঝতে না পারেন মর্ত্যবাসীর মন খারাপ। সপরিবারে দেবীকে রথে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয় রাজবাড়ি দীঘি পর্যন্ত। প্রতিমা নিরঞ্জনে হাজির থাকেন না রাজপরিবারের কোনো সদস্যই। দীর্ঘদিনের এই নিয়ম। নিরঞ্জনের পর আবার নিয়ে আসা হয় পুরনো প্রতিমার কাঠামো। একই কাঠামোতেই প্রতিমা তৈরি হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে।

রাজপরিবারের সদস্য, বয়সে প্রবীণ প্রণত বসু জানালেন, এই পূজার সূচনা হয়েছিল রায়কত বংশে। যাদের আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশে। তৎকালীন সেই রাজপরিবারের রাজধানী ছিল সুবর্ণপুরে। সেই জায়গাও আজ বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে। ১৫১০ সালে পূজা শুরু করেছিলেন বিশু সিংহ ও শিশু সিংহ। কিন্তু পরবর্তীকালে পূজা পরিচালনার দায়িত্ব চলে আসে সংশ্লিষ্ট রাজার মাতুল বংশের হাতে। প্রণত বসুরা সেই বংশেরই উত্তরসূরি। সুবর্ণপুরে শুরু হওয়া পূজাই পরবর্তীতে উঠে আসে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের এই রাজবাড়িতে।

রাজপরিবারের পুরোহিত শিবু ঘোষাল এই প্রসঙ্গে জানালেন, আগে এই পূজায় নরবলি দেওয়া হলেও এখন মানব পুতুল বলি দেওয়া হয়। একই সঙ্গে পায়রা ও ছাগবলি দেওয়া হয়। রাজ পরিবারের একটি স্থায়ী দুর্গাপ্রতিমা রয়েছে। সেটি নিরেট সোনার তৈরি। সেই বিগ্রহ নিত্য পূজা পায়।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পূজার ভোগ অত্যন্ত বিখ্যাত। পূজার সময় এখানে নিরামিষ নয় বরং আমিষ ভোগ রান্না করা হয়। সেই আচারে মাছের ভূমিকা ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশ, চিতল, ইলিশের মাথা দিয়ে কচুশাক এবং বিজয়াদশমীতে পুঁটি মাছের পদ ভোগে থাকতেই হবে। এছাড়া মাকে পান্তাভাত নিবেদন করা হয়। সঙ্গে থাকে খিচুড়ি ভোগ-সহ ব্যঞ্জন। পূজার দিনগুলিতে সকলকেই ভোগ বিতরণ করা হয়। □

শিবপুর পাল বাড়ির দুর্গামা অভয়া রূপে পূজিতা

শ্রীমতী অভয়া নাগ

বিখ্যাত ওষুধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পাল এই পালবাড়ির পূর্বপুরুষ। কথিত আছে খুব ছোটোবেলায় ভাই-বোনে ঝগড়া করে বটকৃষ্ণ পালবাড়ি ছেড়ে শোভাবাজারে মামার বাড়ি চলে যান। সেখানে দাদুর একটি ছোটো শিশিবোতলের দোকান দেখাশোনা করতে করতে ওষুধ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। আস্তে আস্তে দেশ ছেড়ে বিদেশেও তাঁর ওষুধ ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড মেডিক্যাল কোম্পানি নামে।

শিবপুর পালবাড়িতে তখন সর্বেশ্বর পাল এই অভয়া মাতার পূজা করতেন। কালক্রমে তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে তখন উঠতি ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালকে অনুরোধ করেন এই অভয়াদুর্গা মাতার পূজা করার জন্য। কথিত, প্রায় ৩৫০ বছর আগে এক সাধু এই পূজার প্রচলন করেন। এই পূজার বিশেষত এখানে মা অভয়া গণেশকে সঙ্গে নিয়ে এক চালে বিরাজ করেন ডাকের সাজে। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের পরে শান্তমূর্তি এক হাতে আশীর্বাদের ভঙ্গি অন্য হাতে একটি পদ্ম বা ফল ধারণ করে বসে আছেন। এখানে মায়ের মূর্তি দ্বিভুজা এবং অসুরবিহীন।

কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে মায়ের বোধন শুরু হয় আর দুর্গাপূজার নবমীতে চণ্ডীপাঠ শেষ হয়। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা বা কলাবউয়ের মহাস্নান এই বাড়ির উঠানে নয়টি ঘট এবং বিভিন্ন সাগরের জল দিয়ে সমাপন হয়। অষ্টমীর মূল আকর্ষণ ধুনাপোড়ানো এবং কুমারী পূজা। অষ্টমীর দিন বাড়ির মেয়ে বউয়েরা এবং পাড়াপ্রতিবেশী-সহ একসঙ্গে প্রায় ৪০ জন মাথায় হাতে মালসা নিয়ে ধুনা পোড়ানো হয়। সন্ধিপূজার সময় একটি কালো পাঁঠা মায়ের সামনে বলি দেওয়া হয়। এটি এখানকার বিশেষ অঙ্গ। বলা হয়ে থাকে আন্দুল রাজবাড়ি, শিবপুর পাল বাড়ির মা-অভয়া আর শিবপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গা তিন বোন। আগে আন্দুল রাজবাড়ি থেকে সন্ধি পূজার সময় কামান দাগা হতো তারপর পাল বাড়ির পূজা আরম্ভ হতো।

নবমীর দিন একটি পাঁঠা, ৫টি ফল এবং সবশেষে একটি মহিষ মায়ের সামনে এখনো বলি দেওয়া হয়। মোষের মুণ্ডু গঙ্গায় ভাগিয়ে দেওয়া হতো। দেহটি হরিজন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিয়ে যায়। সবশেষে হোম দিয়ে মায়ের পূজা সমাপ্ত হয়।

শোভাবাজারে বটকৃষ্ণ পাল বিরাট অট্টালিকা এবং সংলগ্ন বি.কে. পাল পার্ক এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। একবার বটকৃষ্ণ পাল এই অভয়ামাতাকে তার নিজের অট্টালিকায় নিয়ে যাবার মনস্থির করেন কিন্তু শিবপুরের অভয়ামাতা তাঁকে স্বপ্নে জানিয়ে দেন তিনি এই ঠাকুর দালান ছেড়ে কোথাও যাবেন না আর বলেন তুই আমাকে অন্য মূর্তিতে নিয়ে আয় সেই থেকে শোভাবাজার বটকৃষ্ণ পালের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

পাল বাড়ির এই পূজায় জাঁকজমক হয়তো থাকে না কিন্তু পূজার চারদিন একেবারে ঘড়ি ধরে নিষ্ঠা সহকারে পুরানো ঐতিহ্য মেনে পালন করা হয়। দশমীর দিন আগে বাড়ির ছেলেরা কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন কিন্তু এখন পরিবার ছোটো হয়ে যাওয়া এবং কাজের সূত্রে বাইরে থাকার জন্য লরি করে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয়। ওইদিন বাড়ির সকল সদস্য-সহ পাড়া প্রতিবেশী মায়েরাই প্রায় ৫০ থেকে ৭০ জন ঠাকুরকে বরণ করেন এবং সেই সঙ্গে সিঁদুর খেলার উৎসব পালন করেন।

এই পূজার সঙ্গে যুক্ত যারা প্রবাসে/বিদেশে বা অন্য শহরে থাকেন তারা এই পূজার চারটি দিনের জন্য তাকিয়ে থাকেন এবং সময়মতো উপস্থিত হয়ে এক পারিবারিক মিলন উৎসবে পরিণত করেন। □

দশঘরা বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা

শুভজিত শূর

শৈবতীর্থ তারকেশ্বরের অদূরে বর্ধমানের পথে দশঘরা অঞ্চলটি অবস্থিত। এখানকার শারদীয়া দুর্গাপূজা নানা কারণে বৈচিত্র্যময়। এই বিবিধতার জন্যই আজ বঙ্গপ্রদেশের দুর্গাপূজা বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওড়িশার রাজা আনন্দবর্মণের প্রতিভূ শাসকরূপে সদানন্দ নামক এক অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত ভূভাগের শাসন পরিচালনার জন্য দশঘরাতে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তাঁর চল্লিশ বিঘা জুড়ে স্থাপিত দশনহর নামের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজ বারদ্বারী নামে বিখ্যাত। সদানন্দের আদিগ্রাম বর্মপুর থেকে আনীত দেবী চণ্ডীর পবিত্র ঘটটি কুলদেবীরূপে পূজিতা হতে থাকে। বহুকাল পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত দুর্গাদালান আজও বিরাজমান। ওই ঘটে শারদীয়া দুর্গাপূজা চলতে থাকে।

ষোড়শ শতাব্দীতে দেববিশ্বাস নামক সদানন্দের বংশধরদের সকলে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। তারপর রাধাগোপীনাথ নামে তাদের কুলদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওই সময়ে চণ্ডীঘটটি মালিপাড়ায় গুরুকুলে প্রথাগতভাবে স্থানান্তরিত হয়। এই অবস্থায় ধর্মীয় প্রধানেরা স্থির করেন যে শাস্ত্রীয় দুর্গাপূজা মাটির মূর্তিতে সম্পন্ন হবে। এই 'জয় দুর্গা' ওড়িশার মূর্তি বিদ্যারীতি অনুযায়ী নির্মিত হয়ে আজও পূজিতা হয়ে চলেছে। দেববিশ্বাস পরিবারের এই প্রতিমা বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই প্রতিমাতে মায়ের চার হাতে তরবারি, ঢাল, ত্রিশূল ও সর্প শোভিত যাতে ওড়িশার মূল রীতি স্বীকৃত। চালচিত্রে কার্তিক ও গণেশ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপরে স্থাপিত। এই অর্ধচন্দ্রাকার চালি বিষ্ণুপুরী ঘরানাতে বিখ্যাত। বিষ্ণুপুরী ধাঁচে দেববিশ্বাস পরিবারের পূজার প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। গণেশের দুইটি হাত যা কিনা চতুর্ভুজা দুর্গার বিপরীত। মরাঠী গণেশের মতো এই গণেশ চিন্তামণি গণেশ রূপে প্রকাশিত।

নবরাত্রি বা প্রতিপদ থেকে বিশ্বাস পরিবার ঐতিহাসিক বেদীতে দুর্গাপ্রতিমার বাঁ দিকে চণ্ডীঘট স্থাপন করেন। গণেশের ঘট শাস্ত্রীয় পরম্পরা অনুযায়ী দেবীঘটের বাঁদিকে স্থাপন করা হয়। পূজার সময়ে 'চিরকাঠি' বা পবিত্র সুতার ঘেরাটোপ দেওয়া হয় না, কারণ মনে করা হয় ওই পূজা দেবী চণ্ডীর চিরাচরিত মূল পূজার অঙ্গ। নবপত্রিকা অর্থাৎ পবিত্র বৃক্ষের শাখাগুলি গোপীনাথের রন্ধনশালাতে রাখা হয়। মহাষষ্ঠীর রাতের এই বিশেষ ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে নবপত্রিকা পরবর্তী সংযোজন এবং এটি নিয়মিত দৈনিক পূজার আবশ্যিক অঙ্গ নয়।

বিশ্বাস পরিবারের এই দুর্গাপূজা তাদের কুলদেবতা দৈনিক চণ্ডীপূজারই বিস্তারমাত্র। এই পূজা রক্তপাত ও হিংসা বর্জন করে চললেও কেবল মহাসপ্তমী, সন্ধিপূজা ও মহানবমীতে পশুবলি হয়। তবে বৈষ্ণবধর্মের আগে শাক্ত পরম্পরা থাকলেও পরিবারের সদস্যরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ সম্পূর্ণ বন্ধ করেছে।

পূজায় রক্তপাতের সময়ে রাধাগোপীনাথকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় ও কানে তুলে গুঁজে দেওয়া হয় যাতে তাঁকে এইসব দৃশ্য ও শব্দ সহ্য করতে না হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, পুরীর জগন্নাথ মন্দির চত্বরে বিমলা মন্দিরেও পশুবলি হয়ে থাকে।

বিসর্জনের আগে দেবীর মুকুট তিরোলে (আরামবাগ সন্নিকটস্থ) পাঠাবার জন্য খুলে নেওয়া হয়। সেখানে কালীপূজায় তা শোভা পায়। কথিত, বহুবছর আগে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসীর কাছে এক সুন্দরী কন্যা আবির্ভূতা হয়ে তাকে কালীপূজা করতে বলে। পরে সেই কন্যার সন্ধান না পাওয়া গেলেও মা-কালীর মাথায় তার টায়রা দেখা যায়। বিশ্বাসবাড়ির এই পূজা দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চলে এলেও দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মিত হতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। □

ত্রিপুরার বনেদি বাড়ির দুর্গা পূজা

কানু রঞ্জন দেবনাথ

ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গাসপ্তমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত চারদিন সরকারি ছুটি থাকে। এই বছর মানে ২০২৩ সালের দুর্গাপূজায় ত্রিপুরা সরকারি ক্যালেন্ডারে দুর্গাপূজার ছুটি অক্টোবরের ২১ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই বছর দুর্গা পূজার জন্য বিজয়া দশমীর পরে (বিজয়া দশমী ২৪শে অক্টোবর) আরও অতিরিক্ত তিনদিন (২৫, ২৬ ও ২৭) বাড়ানো হয়েছে। তারপর ২৮ তারিখ চতুর্থ শনিবার এবং লক্ষ্মী পূজার ছুটি একই দিনে পড়েছে। ২৯ তারিখ আবার রবিবার, তাই সরকারি সাধারণ ছুটি। ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারিরা এই বছর তাই দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা এবং রবিবারের সাধারণ ছুটি মিলিয়ে একসঙ্গে ৯ দিনের ছুটি উপভোগ করতে পারবে।

আগরতলার দুর্গাবাড়ির পূজা : ত্রিপুরার বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গাবাড়ির পূজার কথা। ত্রিপুরার রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পরেই এই পূজার প্রচলন হয়েছিল। এর আগে ত্রিপুরার রাজপরিবারের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তিন জায়গায়। সেই সঙ্গেই স্থানান্তরিত হয়েছে রাজমন্দিরও। আগরতলায় ১৮৩৮ সালে এই মন্দির স্থাপিত করেন মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। তার আগে এই মন্দির ছিল উদয়পুর, অমরপুর এবং পুরাতন আগরতলায়। আগে এই মন্দিরের পূজার আয়োজন ত্রিপুরার রাজপরিবার করলেও গত সাত দশক ধরেই এই পূজার খরচ বহন করছে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার।

ত্রিপুরার রাজবাড়ির দেবী দুর্গা দ্বিভুজা : ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গার দেবী দশভুজা হলেও ত্রিপুরার রাজবাড়ির দেবী দুর্গা দ্বিভুজা। কারণ ত্রিপুরার রাজবাড়ির দেবী লুকিয়ে রাখেন তাঁর আট হাত শাড়ির আঁচলের ভিতরে। এই রূপেই গত ৫১৯ বছর ধরে দেবীর পূজা হয়ে আসছে। ত্রিপুরার রাজবাড়ির এই দুর্গা মন্দিরকে সবাই 'দুর্গাবাড়ি' বলেই চিনে। এখানকার দেবীর রূপের বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর দ্বিভুজা রূপ। এখানকার দেবীর দশটি হাতের বদলে দুটি হাত দৃশ্যমান। বাকি আটটি ছোটো হাত থাকে মায়ের বা দেবীর শাড়ির আঁচলে ঢাকা। এই বিষয়ে একটি লোককাহিনি আছে। লোককাহিনি অনুসারে একবার শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় ত্রিপুরার মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের (যার রাজত্বকাল ছিল ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) স্ত্রী তথা ত্রিপুরার মহারানি রাজপুরোহিতের পরামর্শ ছাড়াই দুপুরবেলায় যখন মা দুর্গার অন্নভোগ অর্পণ করার পর দেবীর ভোগ দর্শনের জন্য দরজা খুলেছিলেন, তখনই তিনি দেখতে পান যে মা দুর্গা দশহাতে অন্নগ্রহণ করছেন। এই দৃশ্য দেখে মহারানি খুব ভয় পেয়ে যান। মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যকে ওই রাতেই মা দুর্গা স্বপ্নে দেখান যে আগামী বছর থেকে যেন দুই হাতের দুর্গামূর্তির কাঠামোতেই যেন তাঁর পূজা করা হয়। সেই থেকেই মা দুর্গা এই রাজবাড়ির পূজায় দ্বিভুজা।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮৬২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল) মহানবমীতে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের অবস্থিত দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে ত্রিপুরার রাজপরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ পূজা দেওয়া হতো। মহারাজা বীরচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। কখনো কখনো মহারাজ নিজেই ঘোড়া চালিয়ে চলে যেতেন উদয়পুরে। বিজয়া দশমীতে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করা হতো। ভোজের সময় মহারাজা নিজে সকলের সঙ্গে মেঝেতে বসে ভোজন করতেন। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ত্রিপুরার তৎকালীন যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্য

দায়িত্ব নিতেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এই পূজায় অংশ নিতে আসতেন। চাকলারোশনাবাদ (বাংলাদেশের অবিভক্ত কুমিল্লা জেলা যা বর্তমানের কুমিল্লা জেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং চাঁদগাও জেলা)-সহ কৈলাশহর, অমরপুর, বিলোনিয়া, তেলিয়ামুড়া, চট্টগ্রাম, ধর্মনগর, গণ্ডাছড়া-সহ বহু এলাকা থেকেই রাজভক্ত প্রজারা আসতেন এই দুর্গাপূজায়।

বিজয়া দশমীর দিন উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের পাশে এখন যেখানে টাউন হল, সেখানে তৎকালীন উজির বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় রাজ্যের সমস্ত দুর্গা প্রতিমা এক জায়গায় জড়ো হতো। সমবেত ঢাক ও কাঁসরবাদন এবং ধুনুচি নৃত্য হতো। প্রথমে মহারাজা বাহাদুর, তারপর মহারানি সমস্ত দুর্গা প্রতিমা দেখে প্রণাম জানাতেন। তারপর দু'তিনটি সুসজ্জিত হাতি, ২০-২৫ জন ঘোরসওয়ার, পদাতিকসৈন্য ও সেনাবাহিনীর ব্যান্ডপার্টিকে সামনে রেখে শোভাযাত্রা শুরু হতো। সবার আগে থাকত প্রভুবাড়ি বা গোঁসাইবাড়ির প্রতিমা, তার পিছনে রাজবাড়ির প্রতিমা, উজিরবাড়ির প্রতিমা, অন্য সভাসদনের প্রতিমা এবং রাজবংশের বিভিন্ন সদস্যদের বাড়ির প্রতিমাগুলি সারিবদ্ধভাবে বাঁশের মাচায় চাপিয়ে কাঁধে নিয়ে দশমী ঘাটের দিকে শোভাযাত্রা এগিয়ে যেত।

প্রভু বাড়ির পূজা : নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধররা এই পূজা করে থাকেন। ২০০৯ সাল থেকে ত্রিপুরা সরকার প্রভু বাড়ির পূজায় অর্থ সাহায্য করে আসছেন। তবে এই পূজা কত বছর চালিয়ে যেতে পারবেন তা নিয়ে বর্তমান পুরোহিতের আক্ষেপ। তাঁর পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সবাই কলকাতায় বসবাস করছেন। তাঁর এক মেয়ে। কাজেই তাঁর অবর্তমানে তাঁর মেয়ে এই পুজা ঠিকমতো চালিয়ে যেতে পারবে কিনা এই ব্যাপারে তিনি চিন্তিত। এই পূজাটি প্রায় দুশো বছর চলে আসছে। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের আমল থেকে এই পূজা চলে আসছে। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন প্রভুবাড়ির বর্তমান পুরোহিত মাধবানন্দের পূর্বপুরুষের শিষ্যা। অর্থাৎ মাধবানন্দের পূর্বপুরুষ ছিলেন মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের প্রভু বা গোঁসাই। তাই বাড়িটিকে প্রভু বাড়ি বলা হয়ে থাকে।

অসিত দেববর্মণের বাড়ির দুর্গাপূজা : আগরতলার টিআরটিসি অফিসের পাশে অবস্থিত এই পূজাটি প্রায় একশো বছর ধরে চলে আসছে। এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই পূজার অসুরের দু' হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা। অন্যান্য জায়গায় অসুরকে মায়ের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পেলেও এই পূজায় অসুর দু' হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এছাড়া আগরতলার অন্যান্য বনেদি বাড়ির পূজাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী বাড়ির পূজা : ঠাকুর পল্লী রোড, কের চৌমুহিনী।

বর্দ্ধন বাড়ির পূজা : জয়নগর মধ্যপাড়ায়।

সূত্রধর বাড়ির পূজা : আগরতলা অনুকুল ঠাকুরের আশ্রমের পাশে অবস্থিত হরিশ ঠাকুর রোডে অবস্থিত।

উদয়পুরের বনেদি বাড়ির দুর্গা পূজা : ত্রিপুরার রাজধানী এক সময় উদয়পুরে ছিল। উদয়পুরের বনেদি বাড়ির পূজাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো,

মন্ত্রীবাড়ির পূজা : গিরিধারী পল্লীতে।

সত্য দে'র বাড়ির পূজা : নিউটাউন রোডে।

রঞ্জিত ভৌমিক বাড়ির পূজা : গোকুলপুরে।

বিন্দু দত্তের বাড়ির পূজা : রমেশ চৌমুহিনীতে।

সাধন সরকারের বাড়ির পূজা : ধবজনগরের বুড়ির মাঠে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশালগড়ের বনেদি বাড়ির দুর্গা পূজা : বিশালগড়ের বনেদি বাড়ির দুর্গা পূজার মধ্যে রঘুনাথপুরের পোদ্দার বাড়ির পূজাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বাড়ির পূজাটি প্রায় ২৬ বছর যাবৎ হয়ে আসছে।

রামেন্দ্র ভবনের সার্ধ ত্রিশতাব্দী প্রাচীন দুর্গাপূজা

অশোক কুমার ঠাকুর

কোচবিহারের রামেন্দ্র ভবনের ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপূজা সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো। দেশভাগের কয়েক বছর আগে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) ভট্টাচার্য পরিবারের মূল শাখা রংপুর ছেড়ে কোচবিহার চলে আসে এবং সুভাষপল্লি ধর্মতলা মোড়ে বসতি স্থাপন করেন। সেই যারা এসেছিলেন তারা তাদের এক প্রজন্ম আগের পূর্বপুরুষ রামেন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে বাড়ির নাম রাখেন 'রামেন্দ্র ভবন'। সঙ্গে নিয়ে আসেন শালগ্রাম শিলা 'রাজ-রাজেশ্বর'। রাজ-রাজেশ্বর আজও নিত্যপূজিত হয়। রামেন্দ্র ভবনের ঠাকুর দালানেই তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী সার্ধ ত্রিশতাব্দী প্রাচীন দুর্গা পূজা আজও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

এই দুর্গাপূজার কিছু বিধি নিয়ম আছে। প্রতিপদে দেবীর ঘট স্থাপন করা হয়। ষষ্ঠীর দিন বেলগাছের: নীচে বেলবরণ পূজা করা হয়। ২০২০ সাল পর্যন্ত নবমীতে জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া হতো। একটি কালো ও একটি সাদা পাঁঠা। বর্তমানে বলিকারের অভাবে ২০২১ থেকে পাঁঠা বলি বন্ধ আছে। সপ্তমী ও অষ্টমীতেও একটি করে পাঁঠা বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। এখন নবমীতে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। পূজার তিনদিন মায়ের ভোগে থাকে শোল ও বোয়াল মাছের ঝোল, খিচুড়ি, চাল ও কলার বড়া।

মহালয়ার দিন থেকে হাতে লেখা তালপাতার পুঁথি বর্ণিত চণ্ডী পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় ভট্টাচার্য বাড়ির ঐতিহাসিক দুর্গা পূজা। এই পুঁথিটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি রঘুনন্দনজীর শ্রীশ্রী চণ্ডী। পুঁথির অনুলিপি লিখিত হয়েছিল ১২৬৩ বঙ্গাব্দে। কোচবিহারের রামেন্দ্র ভবনের পূজার বয়সও নেহাত কম নয় এ বছর একাশিতম বর্ষে পদার্পণ করলো।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মহিষাদল রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা

নারায়ণ চন্দ্র পণ্ডা

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আনুমানিক ১৫৫৭ সালে বর্তমান উত্তর প্রদেশ থেকে আকবর বাদশাহের সৈন্য বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে অবসর নিয়ে গেঁয়োখালিতে উপস্থিত হয় বাবু জনার্দন উপাধ্যায়। স্থানীয় গড়গুমাইয়ের রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে ব্যবসায়ীসূত্রে যুক্ত হন। কথিত, আকবর নবাব বাহাদুরকে খাজনা দিতে না পারায় জনার্দন রায় বাহাদুরের কাছে মহিষাদল পরগনা বন্ধক রাখায় জনার্দন উপাধ্যায় বকেয়া খাজনা মিটিয়ে দেন। পরে ওই ঋণ শোধ করতে না পারায় রাজা কল্যাণ রায় মহিষাদল পরগনা জনার্দন উপাধ্যায়কে প্রদান করেন।

১৭৮০ সালে বড়রানি জানকী দেবী উত্তরপ্রদেশ থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আনিয়ে শারদীয়া উৎসব— প্রতিপদ থেকে নবমী, নবরাত্রি দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ, ঘটে পটে পূজা আরতি নয় দিন ধরে চলে। দশ দিনের দিন বিসর্জন হতো। একটানা নয় রাত্রি পর্যন্ত ব্রত রেখে দশমির দিন সমাপন হয় বলে একে নবরাত্রি ব্রত বলা হয়। পরে রানি ইন্দ্রাণী দেবীর আমলে স্থায়ী চণ্ডীমণ্ডপ তৈরি হলে তখন মা দশভুজার মূর্তি তৈরি করে দশ দিনের পূজা আজও হয়ে আসছে। এক মেড়ে সাবেকি প্রতিমা রাজবাড়ির বিশেষত্ব ও ঐতিহ্য।

জনশ্রুতি, প্রতিপদে পূজার সূচনায় ঘটের বেদীতে অঙ্কুরিত যবের প্রলেপ দেওয়া হয়। ওই বেদীর অঙ্কুরিত যবের দশ দিনের বৃদ্ধির ওপর ওই বছরের ওই দেশের শস্যের উৎপাদনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। দেবী দুর্গার শাকম্ভরী রূপের প্রকাশ এখানে ফুটে থাকে। প্রতিদিন নিষ্ঠা সহকারে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে-রাত্রি চারবার পূজা আরতি হয়। ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন যেমন বেলতলায় অধিবাস হয় এখানেও তেমন হয়। সপ্তমীর দিন নব পত্রিকার মহাস্নান, সপ্তমী বিহীত পূজা আরতি হয়, অষ্টমীর দিন মহা অষ্টমীর পূজা, সন্ধি পূজা। নবমীর দিন নবমী বিহিত পূজা, হোম যজ্ঞ ভবানী মায়ের বিশেষ পূজা ইত্যাদি হয়ে দশমীর দিন বিসর্জন পূজা, কনকাঞ্জলি ও সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে রাজদিঘিতে দেবী প্রতিমার বিসর্জনের মাধ্যমে দুর্গা পূজার সমাপ্তি হয়। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় রাজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষ বা ভক্তের দল মিলেমিশে এক হয়ে যায়। চলে কোলাকুলি, প্রীতি বিনিময়, মিষ্টিমুখ।

বিষ্ণুপুর ব্লকের অযোধ্যা গ্রামের জমিদার বাড়ির পূজা

অরিজিৎ গাঙ্গুলী

বিষ্ণুপুর শহরের থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে অযোধ্যা গ্রাম। সেই গ্রামই রয়েছে বাঁকুড়া জেলার অনন্য এক দেবোত্তর এস্টেট। প্রায় ২৩০ বছর আগে গ্রামেরই সন্তান রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরির খোঁজে যান তৎকালীন মুর্শিদাবাদে। পরে নিজের দক্ষতায় হয়ে ওঠেন দেওয়ান। উপার্জন করেন বিপুল অর্থ, গ্রামে ফিরে এসে সেই অর্থ দিয়েই শুরু করেন দুর্গাপূজা। পরবর্তী সময়ে তারই বংশধর গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে তোলেন এক বিশাল জমিদারি। তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয় সিংহবাহিনী মায়ের মন্দির। পাশাপাশি তৈরি হয় গিরি গোবর্ধন মন্দির, ঝুলন মন্দির, রাসমন্দির ও ১২টা শিব মন্দির।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপূজার বিশেষ আকর্ষণ হলো মায়ের প্রতিমা। বিশেষ করে বাহন হলো বাঘ। কথিত, মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়েছিল। এখনো এই পূজা হয়ে চলেছে সেই একই নিয়মে। সাজ সজ্জা থেকে নিয়ম নিষ্ঠা কোনো বিষয়ই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। এখনো নবপত্রিকা আনা হয় রুপোর দোলাতে করে। দেবীমূর্তি কোনো ছাঁচের সাহায্যে নয়, মূর্তিকারের নিজে হাতে তৈরি হয়। কালের প্রভাবে হয়তো বৈভবে কিছু কম হয়েছে, কিন্তু দেবী আরাধনায় নিষ্ঠার কোনো কম হয়নি। আজও মহা ধুমধামে পালিত হচ্ছে দুই শতক প্রাচীন এই দুর্গাপূজা।

আধুনিক দুর্গাপূজার আদিপীঠ গুপ্তিপাড়া দুর্গাবাড়ি

পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য

বঙ্গদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস যদিও অনেক প্রাচীন, কিন্তু বর্তমান সময়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে দুর্গাপূজা, তার সূচনা হুগলির উত্তর সীমায় গঙ্গাতীরবর্তী এই গুপ্তিপাড়া দুর্গাবাড়িতে। সে বহু বছর আগের কথা।

চৈতন্যদেবের জন্মের তখনও ৩৫-৪০ বছর দেরি আছে (আজ থেকে আনুমানিক ৫৭৩ বছর আগে)। নদীয়ারাজের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য এক অনিবার্য কারণে নদীয়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। এক আষাঢ় মাসের প্রবল জল-ঝড়ের রাতে সপরিবারে কুলদেবতা রাজরাজেশ্বর নারায়ণকে মাথায় নিয়ে নৌকা ভাসালেন গঙ্গায়, উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপুর, কিন্তু ঝড়ে নৌকা গঙ্গার অপর পাড়ে গুপ্তপল্লী তথা গুপ্তিপাড়ায় এসে ভিড়ল। রাতে নদীতীরের গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সক্ষাৎ হলো তাঁর। কিছু তিলি সম্প্রদায়ের মানুষের (যাঁরা নিজস্ব ঘানিতে তেল ভাঙাতেন) থেকে একটি সুবর্ণমুদ্রার বিনিময় ১৬ বিঘা ভদ্রাসনটি কিনে বসবাস শুরু করেন। তাঁর মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতের আসার খবর পেয়ে স্থানীয় পণ্ডিতেরা সবাই দেখা করতে এলে তাঁদের কাছে সার্বভৌম ঘোষণা করলেন দুর্গাপূজা করার কথা। পরবর্তী আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় (রথদ্বিতীয়া) কাঠামোপূজার মাধ্যমে শুরু হলো দুর্গোৎসবের এক নতুন অধ্যায়। পরবর্তীকালে ১২ বছর নিজে পূজা করে পরে পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালংকারের উপর দায়িত্ব দিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য নীলাচলে চলে যান। কেটে গেছে ১৫ প্রজন্ম। এরই মধ্যে বংশের কুলগৌরব সাধকপ্রবর ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ (সাধকনাম শ্রীশ্রীযুগবশিষ্ঠদেব) বাংলার ১৩৫১ সালের ৩১শে বৈশাখ মায়ের স্বপ্নাদেশে অষ্টধাতুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায় মা আজ এখানে নিত্যবিরাজিতা। তবুও শারদীয়া পূজায় দুর্গাবাড়ি বিশেষভাবে অনুরণিত হয় সেই সুদুর্লভ সাধনার স্পন্দনে। লাইট-প্যান্ডেল-মাইক-থিম সবকিছুর থেকে অনেক দূরে নিরবে নিভৃতে মা অন্তরের আকুতিতে ডাকার জন্য দুর্গাবাড়ি আজও প্রতি বছরের মতো প্রতীক্ষমান।

বাঁকুড়া কোষ্ঠিয়া গ্রামের শীট পরিবারের দুর্গাপূজা

তপন দানা

বাঁকুড়া ২ ব্লকের কোষ্ঠিয়া গ্রাম শীট পরিবারের দুর্গাপূজা ৩০০ বছর অতিক্রান্ত। শীট বংশের সার্থক শীট গ্রামের এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সার্থক শীট ছিলেন খুব দরিদ্র এক কৃষক। একদিন দেবী স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে পূজা শুরু করতে বলেন। সার্থকবাবুও দেবীর আজ্ঞা অনুসারে নিজ সাধ্যমতো দেবী আরাধনায় ব্রতী হন। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার উন্নতি শুরু হয়। কালক্রমে তার যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্তি হয়। তিনি তৈরি করেন এক বিশাল দুর্গা মন্দির। ধীরে ধীরে এই পূজা গ্রামের সকলের পূজার রূপ নেয়। এক সময়ের অনাড়ম্বর দেবী আরাধনা হয়ে ওঠে ওই গ্রাম তথা আশেপাশের অনেক গ্রামের পূজা। সেজে উঠত সমস্ত গ্রাম। দূরদূরান্ত থেকে ওই পূজা দেখতে উপচে পড়ত ভিড়। মহাষ্টমীর দিন বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের দাগা তোপের শব্দে শুরু হতো সন্ধিপূজা। নবমীর দিন গ্রামে সহভোজের আয়োজন হতো।